প্রোফেসর শঙ্কু

কম্পু

সত্যজিৎ রায়

১২ই মার্চ, ওসাকা

আজ সারা পৃথিবী থেকে আসা তিনশোর উপর বৈজ্ঞানিক ও শাঁখানেক সাংবাদিকের সামনে কম্পপুর ডিমনস্ট্রেশন হয়ে গেল। ওসাকার নামুরা টেকনলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের হলঘরের একপ্রান্তে মঞ্চের উপর একটা তিন ফুট উঁচু পেলুসিডাইটের তৈরি স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো স্তম্ভ বা স্ট্যান্ডের উপর কম্পপুকে বসানো হয়েছিল। দর্শক বসেছিল মখমলে মোড়া প্রায় সোফার মতো আরামদায়ক সিটে। এখানকার দুজন জাপানি কর্মচারী যখন কম্পপুকে নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করল, তখন এই প্ল্যাটিনামে আচ্ছাদিত আশ্চর্য সুন্দর মসৃণ গোলকটিকে দেখে দর্শকদের মধ্যে একটা বিস্ময়মিশ্রিত তারিফের কোরাসে ঘরটা গমগম করে উঠেছিল। যে কম্পিউটার যন্ত্র পঞ্চাশ কোটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, তার আয়তন হবে একটা ফুটবলের দেড়া, তার ওজন হবে মাত্র বেয়াল্লিশ কিলো, আর তাকে দেখে যন্ত্র বলে মনেই হবে না, এটা কেউ ভাবতে পারেনি। আসলে এই ট্রানজিসটার আর মাইক্রো-মিনিয়েচারাইজেশন বা অতিক্ষুদ্রকরণের যুগে খুব জটিল যন্ত্রও আর সাইজে বড় হবার দরকার নেই। পঞ্চাশ বছর আগে বেঢপ বাক্স-রেডিওর যুগে কি আর কেউ ভাবতে পেরেছিল যে ভবিষ্যতে একটা রিস্টওয়াচের ভিতরে একটা রেডিওর সমস্ত যন্ত্রপাতি পুরে দেওয়া যাবে?

কম্পু যে মানুষের এক আশ্চর্য সৃষ্টি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এও সত্যি যে, জটিল যন্ত্র তৈরির ব্যাপারে এখনও প্রকৃতির ধারেকাছেও পৌঁছাতে পারেনি মানুষ। আমাদের তৈরি যান্ত্রিক মস্তিষ্কের ভিতর পোরা আছে দশ কোটি সার্কিট, যার সাহায্যে যন্ত্র কাজ করে। মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন হল কম্পপুর পাঁচ ভাগের এক ভাগ। এই মস্তিষ্ক যার সাহায্যে অবিরাম তার অসংখ্য কাজগুলো করে যাচ্ছে তার নাম নিউরন। এই নিউরনের সংখ্যা হল দশ হাজার কোটি। এ থেকে বোঝা যাবে মস্তিষ্কের কারিগরিটা কী ভয়ানক রকম জটিল।

এখানে বলে রাখি, আমাদের কম্পিউটার অঙ্ক কষে না। এর কাজ হল যে সব প্রশ্নের উত্তর জানতে মানুষ বিশ্বকোষ বা এনসাইক্লোপিডিয়ার শরণাপন্ন হয়, সেই সব প্রশ্নের

www.bengaliebook.com

উত্তর দেওয়া। আরও একটা বিশেষত্ব এই যে, এই উত্তর অন্য কম্পিউটারের মতো লিখিত উত্তর নয়; কম্পু উত্তর দেয় কথা বলে। মানুষের গলা আর বিলিতি রুপোর বাঁশির মাঝামাঝি একটা তীক্ষ্ণ স্পষ্ট স্বরে কম্পপু প্রশ্নের জবাব দেয়। প্রশ্ন করার আগে ওয়ান থ্রি ওয়ান থ্রি ওয়ান থ্রি সেভূন—এই সংখ্যাটি বলে নিতে হয়, তার ফলে কম্পুর ভিতরের যন্ত্র চালু হয়ে যায়। তারপর প্রশ্নটা করলেই তৎক্ষণাৎ উত্তর পাওয়া যায়। গোলকের একটা অংশে এক বর্গ ইঞ্চি জায়গা জুড়ে দুশোটা অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র দিয়েই প্রশ্ন ঢোকে, এবং এই ছিদ্র দিয়েই উত্তর বেরোয়। অবিশ্যি প্রশ্নগুলো এমনই হওয়া দরকার যার উত্তর মোটামুটি সংক্ষেপে হয়। যেমন, আজকের ডিমনস্ট্রেশনে এই কথাটা অভ্যাগতদের বলে দেওয়া সত্ত্বেও ফিলিপিনবাসী এক সাংবাদিক কম্পুকে অনুরোধ করে বসলেন-প্রাচীন চিন সভ্যতা সম্পর্কে কিছু বলো। স্বভাবতই কম্পু কোনও উত্তর দিল না। কিন্তু সেই একই সাংবাদিক যখন তাকে তাং, মিং, হান, সুং ইত্যাদি সভ্যতার বিশেষ বিশেষ দিক সম্বন্ধে আলাদা আলাদা করে প্রশ্ন করলেন, তখন কম্পু মুহূর্তের মধ্যে ঠিক ঠিক জবাব দিয়ে সকলকে অবাক করে দিল।

শুধু তথ্য পরিবেশন নয়, কম্পপুর বিবেচনার ক্ষমতাও আছে। নাইজেরিয়ার প্রাণিতত্ত্ববিদ ডঃ সলোমন প্রশ্ন করলেন—একটি বেবুনশাবককে কার সামনে ফেলে রাখা বেশি নিরাপদ—একটি ক্ষুধার্ত হরিণ, না একটি ক্ষুধার্ত শিম্পাঞ্জি? কম্পু বিদ্যুদ্বেগে উত্তর দিল—ক্ষুধার্ত হরিণ। হোয়াই? প্রশ্ন করলেন ডঃ সলোমন। রিনারিনে গলায় উত্তর এল—শিম্পাঞ্জি মাংসাশী। এ তথ্যটা অবিশ্যি অতি সম্প্রতি জানা গেছে। দশ বছর আগেও মানুষ জানত বানর শ্রেণীর সব জানোয়ারই নিরামিষাশী।

এ ছাড়া কম্পু ব্রিজ ও দাবা খেলায় যোগ দিতে পারে, গান শুনে সুর বেসুর তাল বেতাল বিচার করতে পারে, রাগরাগিণী বলে দিতে পারে, কোনও বিখ্যাত পেন্টিংয়ের কেবল চক্ষুষ বর্ণনা শুনে চিত্রকরের নাম বলে দিতে পারে, কোনও বিশেষ ব্যারামে কী ওষুধ কী পথ্য চলতে পারে সেটা বলে দিতে পারে, এমনকী রুগির অবস্থার বর্ণনা শুনে আরোগ্যের সম্ভাবনা শতকরা কত ভাগ সেটাও বলে দিতে পারে।

কম্পপুর যেটা ক্ষমতার বাইরে সেটা হল চিন্তাশক্তি, অনুভবশক্তি আর অলৌকিক শক্তি। তাকে যখন আজ সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ম্যাক্সওয়েল জিজ্ঞেস করলেন আজ থেকে একশো বছর পরে মানুষ বই পড়বে কি না, তখনও কম্পু নিরুত্তর, কারণ ভবিষ্যদ্বাণী তার ক্ষমতার বাইরে। এই অভাব সত্ত্বেও একটা কারণে কম্পপু মানুষকে টেক্কা দেয়, সেটা হল এই যে, তার মস্তিষ্কে যে তথ্য ঠাসা রয়েছে তার ক্ষয় নেই। বয়স হলে অতি বিজ্ঞ মানুষেরও মাঝে মাঝে স্মৃতিভ্রম হয়। যেমন আমি এই কিছুদিন আগে গিরিডিতে আমার চাকরকে প্রহ্লাদ বলে না ডেকে প্রয়াগ বলে ডাকলাম। এ ভুল কম্পু কখনও করবে না, করতে পারে না। তাই মানুষের তৈরি হয়েও সে একদিক দিয়ে মানুষের চেয়ে বেশি কর্মক্ষম।

এখানে বলে রাখি যে কম্পু নামটা আমারই দেওয়া, আর সকলেই নামটা পছন্দ করেছে। যন্ত্রের পরিকল্পনার জন্য দায়ী জাপানের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাৎসুয়ে—যাঁকে ইলেকট্রনিকসের একজন দিকপাল বলা চলে। এই পরিকল্পনা জাপান সরকার অনুমোদন করে, এবং সরকারই এই যন্ত্র নিমাণের খরচ বহন করে। নামুরা ইনস্টিটিউটের জাপানি কমীরা যন্ত্রটা তৈরি করেন প্রায় সাত বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে। চতুর্থ বছরে প্রাথমিক কাজ শেষ হবার কিছু আগে মাৎসুয়ে পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশের সাতজন পণ্ডিত ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানান এই যান্ত্রিক মগজে তথ্য ঠাসার ব্যাপারে সাহায্য করতে। বলা বাহুল্য, আমি ছিলাম। এই সাতজনের একজন। বাকি ছজন হলেন-ইংলন্ডের ডঃ জন কেনসিলি, যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির ডঃ স্টিফেন মেরিভেল, সোভিয়েত রাশিয়ার ডঃ স্টাসফ, অষ্ট্রেলিয়ার প্রোফেসর স্ট্র্যাটন, পশ্চিম আফ্রিকার ডঃ উগাটি ও হাঙ্গেরির প্রোফেসর কুটুনা। এর মধ্যে মেরিভেল জাপানে রওনা হবার তিনদিন আগে হৃদরোগে মারা যান; তাঁর জায়গায় আসেন। ওই একই ইনস্টিটিউটের প্রোফেসর মাকসি উইঙ্গাফিল্ড। এঁদের কেউ কেউ টানা তিন বছর থেকেছেন। ওসাকায় জাপান সরকারের অতিথি হয়ে; আবার কেউ কেউ, যেমন আমি, কিছুকাল এখানে কাটিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে কিছু কাজ সেরে আবার এখানে চলে এসেছে। আমি এইভাবে যাতায়াত করেছি। গত তিন বছরে এগারোবার।

এখানে একটা আশ্চর্য ঘটনার কথা বলি। গত পরশু অর্থাৎ ১০ই মার্চ ছিল সূর্যগ্রহণ। এবার যেসব জায়গা থেকে পূর্ণগ্রাস দেখা গেছে, তারমধ্যে জাপানও পড়েছিল। এটা একটা বিশেষ দিন বলে আমরা গত বছর থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম যে, যেভাবে হোক গ্রহণের আগেই আমাদের কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। ৮ই মার্চ কাজ শেষ হয়েছে মনে করে যন্ত্রটাকে পরীক্ষা করে দেখা গেল কথা বেরোচ্ছে না। গোলকাটা দুটো সমান ভাগে ভাগ হয়ে খুলে যায়। সার্কিটে গণ্ডগোল আছে মনে করে সেটাকে খুলে ফেলা হল। দশ কোটি কম্পোনেন্টের মধ্যে কোথায় কোনটাতে গণ্ডগোল হয়েছে খুঁজে বার করা এক দুরূহ ব্যাপার।

দুদিন দুরাত অনুসন্ধানের পর ১০ই ঠিক যে মুহূর্তে গ্রহণ লাগবে।–অর্থাৎ দুপুর একটা সাঁইত্রিশে–ঠিক সেই মুহূর্তে কম্পপুর স্পিকারের ভিতর দিয়ে একটা তীক্ষ্ণ শিসের মতো শব্দ বেরোল। এটাই কম্পুর আরোগ্যের সিগন্যাল জেনে আমরা হাফ ছেড়ে গ্রহণ দেখতে চলে গেলাম। অর্থাৎ গ্রহণ লাগার মুহূর্ত আর কম্পুর সক্রিয় হবার মুহূর্ত এক। এর কোনও গূঢ় মানে আছে কি? জানি না।

কম্পু ইনস্টিটিউটেই রয়েছে। তার জন্য একটা শীততাপনিয়ন্ত্রিত আলাদা কামরা তৈরি হয়েছে। ভারী সুদৃশ্য ছিমছাম। এই কামরা। ঘরের একপাশে দেয়ালের ঠিক মাঝখানে তার স্ফটিকের বেদির ওপর যন্ত্রটা বসানো থাকবে। বেদির ওপরে একটা বৃত্তাকার গর্ত ঠিক এমন মাপে তৈরি হয়েছে যে, কম্পু সেখানে দিব্যি আরামে বসে থাকতে পারে। কামরার উপরে সিলিংয়ে একটি লুকোনো আলো রয়েছে, সেটা এমনভাবে রাখা যাতে আলোকরশ্মি সটান গিয়ে পড়ে কম্পুর ওপর। এই আলো সর্বক্ষণ জ্বলবে। কামরায় পাহারার বন্দোরস্ত আছে, কারণ কম্পুর্ণ একটি মহামূল্য জাতীয় সম্পত্তি। এইসব ব্যাপারে আন্তজাতিক ঈষার কথাটা ভুললে চলবে না। উইঙ্গাফিল্ডকে এর মধ্যেই দু-একবার গজগজ করতে শুনেছি; তার আক্ষেপ, এমন একটা জিনিস আগেভাগে জাপান তৈরি করে ফেলল, যুক্তরাষ্ট্র পারল না। এখানে উইন্সফিল্ড সম্বন্ধে একটা কথা বলে নিই; লোকটি যে গুণী তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাকে কারুরই বিশেষ পছন্দ নয়। তার একটা কারণ

অবিশ্যি এই যে, উইঙ্গাফিল্ড হাসতে জানে না। অন্তত গত তিন বছরে ওসাকাতে তাকে কেউ হাসতে দেখেনি।

বাইরে থেকে আসা সাতজন মনীষীর মধ্যে তিনজন আজ দেশে ফিরে যাচ্ছে। যারা আরও কয়েকদিন থেকে যাচ্ছে তারা হল উইঙ্গাফিল্ড, কেনসিলি, কুটুনা আর আমি। উইন্সফিল্ড বাতের রুগি, সে ওসাকার একজন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছে। আমার ইচ্ছা জাপানটা একটু ঘুরে দেখব। কাল কিয়োটো যাচ্ছি। কেনসলির সঙ্গে। কেনন্সলি পদার্থবিজ্ঞানী হলেও তার নানান ব্যাপারে উৎসাহ। বিশেষ করে জাপানি আর্ট সম্বন্ধে তো তাকে একজন বিশেষজ্ঞই বলা চলে। সে কিয়োটো যাবার জন্য ছটফট করছে; ওখানকার বৌদ্ধমন্দির আর বাগান না দেখা অবধি তার সোয়াস্তি নেই।

হাঙ্গেরির জীববিজ্ঞানী ক্রিস্টফ কুটুনার আর্টে বিশেষ উৎসাহ নেই, তবে তার মধ্যে একটা দিক আছে। যেটা সম্বন্ধে অন্যে না জানলেও আমি জানি, কারণ আমার সঙ্গেই কুটুনা এ বিষয়ে কথা বলে। বিষয়টাকে ঠিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত বলা চলে না। উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। আজ সকালে ব্রেকফাস্টের সময় আমরা একই টেবিলে বসেছিলাম; আমার মতো কুটুনারও ভোরে ওঠা অভ্যাস। কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সে হঠাৎ বলল, আমি সেদিন সূর্যগ্রহণ দেখিনি।

এটা অবিশ্যি আমি খেয়াল করিনি। আমি নিজে ঘটনাটাকে এত বেশি গুরুত্ব দিই, পূর্ণগ্রাসের পর সূর্যের করোনা বা জ্যোতির্বলয় দেখে এতই মুগ্ধ হই যে, আমার পাশে কে আছে না আছে সে খেয়াল থাকে না। কুটুনা কী করে এমন একটা ঘটনা দেখার লোভ সামলাতে পারল জানি না। বললাম, তোমার কি সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে কোনও সংস্কার আছে?

কুটুনা আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে একটা পালটা প্রশ্ন করে বসল।

সূর্যগ্রহণ কি প্ল্যাটিনামের উপর কোনও প্রভাব বিস্তার করে?

করে বলে তো জানি না, আমি বললাম। কেন বলে তো?

তা হলে আমাদের যন্ত্রটা পূর্ণগ্রহণের ওই সাড়ে চার মিনিট এত নিষ্প্রভ হয়ে রইল কেন? আমি স্পষ্ট দেখলাম পূর্ণগ্রহণ শুরু হতেই গোলকাঁটার উপর যেন একটা কালসিটে পড়ে গেল। সেটা ছাড়ল গ্রহণ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে।

তোমার নিজের কী মনে হয়? অগত্যা জিজ্ঞেস করলাম। আমি। মনে মনে ভাবছিলাম কুটুনার বয়স কত, আর তার ভীমরতি ধরল। কি না।

আমার কিছুই মনে হয় না, বলল কুটুনা, কারণ অভিজ্ঞতোটা আমার কাছে একেবারেই নতুন। শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, ব্যাপারটা যদি আমার দেখার ভুল হয় তা হলে আমি খুশিই হব। সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে আমার কোনও সংস্কার নেই, কিন্তু যান্ত্রিক মস্তিষ্ক সম্বন্ধে আছে। মাৎসুয়ে যখন আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি লেখে তখন আমি এ সংস্কারের কথা তাকে জানিয়েছিলাম। বলেছিলাম, যন্ত্রের উপর যদি খুব বেশি করে মানুষের কাজের ভার দেওয়া যায়, তা হলে ক্রমে একদিন যন্ত্র আর মানুষের দাস থাকবে না, মানুষই যন্ত্রের দাসত্ব করবে।

ঠিক এই সময় উইন্সফিল্ড ও কেনুসলি এসে পড়াতে প্রসঙ্গটা চাপা পড়ে গেল। যন্ত্র সম্বন্ধে কুটুনার ধারণাটা নতুন নয়। ভবিষ্যতে মানুষ যে যন্ত্রের দাসে পরিণত হতে পারে তার লক্ষণ অনেকদিন থেকেই পাওয়া যাচ্ছে। খুব সহজ একটা উদাহরণ দিই। মানুষ যে ভাবে যানবাহনের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে সেটা আগে ছিল না। শহরের মানুষও আগে অক্লেশে পাঁচ-সাত মাইল হাঁটত প্রতিদিন; এখন তাদের ট্রাম বাস রিকশা না হলে চলে না। কিন্তু তাই বলে কি আর বিজ্ঞান তার কাজ করে যাবে না? মানুষের কাজ সহজ করার জন্য যন্ত্র তৈরি হবে না? মানুষ আবার সেই আদিম যুগে ফিরে যাবে?

১৪ই মার্চ, কিয়োটো

কিয়োটো সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক যা কিছু শুনেছি। এবং পড়েছি, তার একটাও মিথ্যে বা বাড়ানো নয়। একটা জাতের সৌন্দর্যজ্ঞান আর রুচিবোধ যে একটা শহরের সর্বত্র

এরকমভাবে ছড়িয়ে থাকতে পারে সেটা না দেখলে বিশ্বাস হত না। আজ দুপুরে কিয়োটোর এক বিখ্যাত বৌদ্ধমন্দির আর তার সংলগ্ন বাগান দেখতে গিয়েছিলাম। এমন শান্ত পরিবেশ এর আগে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। মন্দিরে জাপানের বিখ্যাত মনীষী তানাকার সঙ্গে আলাপ হল। ঋষিতুল্য মানুষ। পরিবেশের সঙ্গে আশ্চর্য খাপ খায় এর সৌম্য স্বভাব। আমাদের দিগগজ যন্ত্রটির কথা শুনে স্মিতহাস্য করে বললেন, চাঁদটা সূর্যের সামনে এলে দুইয়ে মিলে এক হয়ে যায় কার খেয়ালে সেটা বলতে পারে তোমাদের যন্ত্র?

দার্শনিকের মতোই প্রশ্ন বটে। সূর্যের তুলনায় চাঁদ এত ছোট, অথচ এই দুইয়ের দূরত্ব পৃথিবী থেকে এমনই হিসেবের যে, চাঁদটা সূর্যের উপর এলে আমাদের চোখে ঠিক তার পুরোটাই ঢেকে ফেলে—এক চুল বেশিও না, কমও না। এই আশ্চর্য ব্যাপারটা যেদিন আমি বুঝতে পারি। আমার ছেলেবেলায়, সেদিন থেকেই সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে আমার মনে একটা গভীর বিস্ময়ের ভাব রয়ে গেছে। আমরাই জানি না। এই প্রশ্নের উত্তর, তো কম্পুজানবে কী করে?

আরও একটা দিন কিয়োটোয় থেকে আমরা কামাকুরা যাব। কেনসিলি সঙ্গে থাকাতে খুব ভাল হয়েছে। ভাল জিনিস আরও বেশি ভাল লাগে একজন সমঝদার পাশে থাকলে।

১৫ই মার্চ

কিয়োটো স্টেশনে ট্রেনের কামরায় বসে ডায়রি লিখছি। কাল রাত দেড়টার সময় প্রচণ্ড ভূমিকম্প। জাপানে এ জিনিসটা প্রায়ই ঘটে, কিন্তু এবারের কাঁপুনিটা রীতিমতো বেশি, আর স্থায়িত্ব প্রায় না। সেকেন্ড। শুধু এটাই যে ফিরে যাবার কারণ তা নয়। ভূমিকম্পের দরুন একটা ঘটনা ঘটেছে যেটার কিনারা করতে হলে ওসাকায় ফিরতেই হবে। আজ ভোর পাঁচটায় মাৎসুয়ে ফোনে খবরটা দিল।

কম্পু উধাও।

টেলিফোনে বিস্তারিতভাবে কিছু বলা সম্ভব হয়নি। মাৎসুয়ে এমনিতেও ভাঙা ভাঙা ইংরিজি বলে, তার উপরে উত্তেজনায় তার কথা জড়িয়ে যাচ্ছিল। এটা জানলাম যে, ভূমিকম্পের পরেই দেখা যায় যে, কম্পু আর তার জায়গায় নেই, আর পেলুসিডাইটের স্ট্যান্ডটা মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। প্রহরী দুজনকেই নাকি অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া যায়, আর দুজনেরই পা ভাঙা, ফলে দুজনেই এখন হাসপাতালে। তাদের এখনও জ্ঞান হয়নি, কাজেই তাদের এ অবস্থা কেন হল সেটা জানা যায়নি।

কিয়োটোতে বাড়ি ভেঙে পড়ে নব্বইজন মেয়ে পুরুষ আহত হয়েছে। স্টেশনে লোকের মুখে আর কোনও কথা নেই। সত্যি বলতে কী কাল যখন ঝাঁকুনিটা শুরু হয় তখন আমারও রীতিমতো অস্থির ও অসহায় মনে হচ্ছিল। কেনসলি সমেত আমি হোটেলের বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম, এবং বাইরে ভিড় দেখে বুঝেছিলাম যে কেউই আর ভিতরে নেই। জাপানে নাকি গড়ে প্রতিদিন চারবার ভূমিকম্প হয়, যদিও তার বেশির ভাগই এত মৃদু কম্পন যে, সিজমোগ্রাফ যন্ত্র আর কিছু পশুপক্ষী ছাড়া কেউই সেটা টের পায় না।

এ কী অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে পড়া গেল! এত অর্থ, এত শ্রম, এত বুদ্ধি খরচ করে পৃথিবীর সেরা কম্পিউটার তৈরি হল, আর হবার তিন দিনের মধ্যে সেটা উধাও?

১৫ই মার্চ, ওসাকা, রাত এগারোটা

আমাদের বাসস্থান ইন্টারন্যাশনাল গেস্ট হাউসে আমার ঘরে বসে ডায়রি লিখছি। নামুরা ইনস্টিটিউটের দক্ষিণে একটা পার্কের উলটোদিকে এই গেস্ট হাউস। আমার জানলা থেকে ইনস্টিটিউটের টাওয়ার দেখা যেত, আজ আর যাচ্ছে না, কারণ সেটা কালকের ভূমিকম্পে পড়ে গেছে।

আজ মাৎসুয়ে স্টেশনে এসেছিল তার গাড়ি নিয়ে। সেই গাড়িতে আমরা সোজা চলে গেলাম ইনস্টিটিউটে। ইতিমধ্যে দুজন প্রহরীর একজনের জ্ঞান হয়েছে। সে যা বলছে তা হল এই—ভূমিকম্পের সময় সে আর তার সঙ্গী দুজনেই পাহারা দিচ্ছিল। কম্পন খুব

জোরে হওয়াতে তারা একবার ভেবেছিল ছুটে বাইরে চলে যাবে, কিন্তু কম্পপুর ঘর থেকে একটা শব্দ শুনে তারা অনুসন্ধান করতে চাবি খুলে ঘরে ঢোকে।

এর পরের ঘটনাটা প্রহরী যেভাবে বলছে সেটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। ঘর খুলেই নাকি দুজনে দেখে যে, কম্পুর স্ট্যান্ডটা মাটিতে পড়ে আছে, আর কম্পু নিজে ঘরের এ মাথা থেকে ও মাথা গড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ভূমিকম্পের জের ততক্ষণে কিছুটা কমেছে। প্রহরী দুজনেই কম্পুর দিকে এগিয়ে যায় তাকে ধরতে। সেই সময় কম্পু নাকি গড়িয়ে এসে তাদের সজোরে আঘাত করে, ফলে দুজনেরই পা ভেঙে যায় এবং দুজনেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

এই আপনা থেকে গড়িয়ে পালিয়ে যাবার বিবরণটা যদি মিথ্যে হয় তা হলে অন্য সম্ভাবনাটা হচ্ছে চুরি। প্রহরী দুজনই যে নেশা করেছিল সেটা মিনিমোতো—অর্থাৎ যার জ্ঞান হয়েছে—স্বীকার করেছে। এই অবস্থায় যদি ভূমিকম্প শুরু হয় তা হলে তারা জাে‌েন বাঁচাতে বাইরে পালাবে সেটা অত্যন্ত স্বাভাবিক। ইনস্টিটিউটের ল্যাবরেটরিতে নাকি কাজ হচ্ছিল সেই রাত্রে, এবং গবেষকরা প্রত্যেকেই নাকি ঝাঁকুনির তেজ দেখে বাইরে মাঠে বেরিয়ে আসে। অর্থাৎ ইনস্টিটিউটের দরজাগুলো সেই সময় বন্ধ ছিল না। কাজেই বাইরে থেকে ভিতরে লোক ঢুকতেও কোনও অসুবিধা ছিল না। দক্ষ চোর এই ভুমিকম্পের সুযোগে একটি বেয়াল্লিশ কিলো ওজনের গোলক বগলদাবা করে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে ইনস্টিটিউট থেকে বেরিয়ে যেতে পারে অনায়াসে।

মোটকথা, চুরি হোক আর না হোক, কম্পু আর তার জায়গায় নেই। কে নিয়েছে, কোথায় রয়েছে, তাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে কি না, এর কোনওটারই উত্তর এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। জাপান সরকার এরমধ্যে রেডিও ও টেলিভিশন মারফত জানিয়ে দিয়েছে যে, যে ব্যক্তি যন্ত্রটা উদ্ধার করতে পারবে তাকে পাঁচ লক্ষ ইয়েন-অর্থাৎ প্রায় দশ হাজার টাকা-পুরস্কার দেওয়া হবে। পুলিশ তদন্ত শুরু করে দিয়েছে, যদিও ইতিমধ্যে দ্বিতীয় প্রহরীরও জ্ঞান হয়েছে, এবং সে-ও অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছে যে, যন্ত্রটা চুরি

www.bengaliebook.com

হয়নি, সেটা নিজেই কোনও আশ্চর্য শক্তির জোরে চালিত হয়ে দুই প্রহরীকেই জখম করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেছে।

প্রহরীদের কাহিনী আমাদের মধ্যে একমাত্র কুটুনাই বিশ্বাস করেছে, যদিও তার সপক্ষে কোনও যুক্তি দেখাতে পারেনি। কেনসিলি ও উইন্সফিল্ড সরাসরি বলেছে চুরি ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। প্ল্যাটিনাম অতি মূল্যবান ধাতু। দামের দিক দিয়ে সোনার পরেই প্ল্যাটিনাম। আজকাল জাপানি ছেলেছোকরাদের মধ্যে অনেকেই নেশার ঝোঁকে বেপরোয়া কাজ করে থাকে। বিশেষ করে সরকারকে অপদস্থ করতে পারলে তারা আর কিছু চায় না। এমন কোনও দল যদি কম্পুকে চুরি করে থাকে তা হলে মোটা টাকা আদায় না করে তাকে ফেরত দেবে না। তাই যদি হয় তা হলে এটা হবে যন্ত্র কিডন্যাপিংয়ের প্রথম নজির।

অনুসন্ধানের কাজটা খুব সহজ হবে বলে মনে হয় না, কারণ ভূমিকম্পের জের এখনও চলেছে। ওসাকায় দেড়শোর ওপর লোক মারা গেছে, আর অল্পবিস্তর জখম হয়েছে প্রায় হাজার লোক। দু-একদিনের মধ্যেই যে আবার কম্পন্ন হবে না। তার কোনও স্থিরতা নেই।

এখন রাত এগারোটা। কুটুনা এই কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত আমার ঘরে ছিল। কম্পুর স্বেচ্ছায় পালানোর কাহিনী সে বিশ্বাস করলেও কেন পালিয়েছে সেটা অনেক ভেবেও বার করতে পারেনি। তার ধারণা, ভূমিকম্পে মাটিতে আছড়ে পড়ে তার যন্ত্রের কোনও গোলমাল হয়ে গেছে। অর্থাৎ তার মতে কম্পুর মাথাটা বিগড়ে গেছে।

আমি নিজে একদম বোকা বনে গেছি। এরকম অভিজ্ঞতা এর আগে কখনও হয়নি।

১৬ই মার্চ, রাত সাড়ে এগারোটা

আজকের শ্বাসরোধকারী ঘটনাগুলো এইবেলা লিখে রাখি। আমরা চার বৈজ্ঞানিকের মধ্যে একমাত্র কুটুনাই এখন মাথা উঁচু করে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, কারণ তার অনুমান যে

অনেকাংশে সত্যি সেটা আজ প্রমাণ হয়ে গেছে। এই ঘটনার পরে ভবিষ্যতে আর কেউ যান্ত্রিক মস্তিষ্ক তৈরি করার ব্যাপারে সাহস পাবে বলে মনে হয় না।

কাল রাত্রে ডায়রি লিখে বিছানায় শুয়ে বেশ কিছুক্ষণ ঘুমোতে পারিনি। শেষটায় আমার তৈরি ঘুমের বড়ি সমনোলিন খাব বলে বিছানা ছেড়ে উঠতেই উত্তরের জানলাটার দিকে চোখ পড়ল। এই দিকেই সেই পার্ক—যার পিছনে নামুরা ইনস্টিটিউট। এই পার্ক হচ্ছে সেই ধরনের জাপানি পার্ক যাতে মানুষের কারিগরির ছাপ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। গাছপালা ফুলফল ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে পায়ে হাঁটা পথ, এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত ছোট বড় পাথরের টুকরো, হঠাৎ এক জায়গায় একটা জলাশয়-যাতে কুলকুলিয়ে জল এসে পড়ছে নালা থেকে-সব মিলিয়ে পরিবেশটা স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক, অথচ সবই হিসেব করে বসানো, সবটাই মানুষের পরিকল্পনা। এক বর্গমাইল জুড়ে এইরকম একটা বন বা বাগান বা পার্ক রয়েছে অতিথিশালা আর ইনস্টিটিউটের মাঝখানে।

বিছানা ছেড়ে উঠে আমার চোখ গেল। এই পার্কের দিকে, কারণ তার মধ্যে একটা টর্চের আলো ঘোরাফেরা করছে। আমার ঘর থেকে দূরত্ব অনেক, কিন্তু জাপানি টর্চের আলোর তেজ খুব বেশি বলে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে জ্বলছে মাঝে মাঝে নিভছে, এবং বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে ঘোরাফেরা করছে আলোটা।

প্রায় মিনিটপনেরো ধরে এই আলোর খেলা চলল, তারপর টর্চের মালিক যেন বেশ হতাশ হয়েই পার্ক ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেলেন।

সকালে নীচে ডাইনিংরুমে গিয়ে বাকি তিনজনকে বললাম। ঘটনাটা এবং স্থির করলাম যে, ব্রেকফাস্ট সেরে পার্কে গিয়ে একবার অনুসন্ধান করব।

আটটা নাগোত আমরা চারজন বেরিয়ে পড়লাম। ওসাকা জাপানের অধিকাংশ শহরের মতোই অসমতল। সারা শহরে ছড়িয়ে আছে সরু সরু নালা আর খাল, আর সেগুলো পেরোবার জন্য সুদৃশ্য সব সাঁকো। রাস্তা থেকে বেশ খানিকটা খাড়াই উঠে

তারপর পার্কের গাছপালা শুরু হয়। তারই মধ্যে একটা হাঁটাপথ দিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম। মেপাল, বার্চ, ওক, চেস্টনাট ইত্যাদি বিলিতি গাছে পার্কটা ভর্তি। অবিশ্যি জাপানের বিখ্যাত চেরিগাছও রয়েছে। জাপানিরা অনেককাল আগে থেকেই তাদের দেশের নিজস্ব গাছ তুলে ফেলে তার জায়গায় বিলিতি গাছের চারা পুতিতে শুরু করেছে, তাই এরকম একটা পার্কে এলে জাপানে আছি সে কথাটা মাঝে মাঝে ভুলে যেতে হয়।

মিনিটপনেরো চলার পরে প্রথম একজন অন্য মানুষকে দেখতে পেলাম পার্কের মধ্যে। একটি জাপানি ছেলে, বছর দশ-বারো বয়স, মাথার চুল কদমছাঁটে ছাঁটা, কাঁধে স্ট্র্যাপ থেকে ঝুলছে ইস্কুলের ব্যাগে। ছেলেটি আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আমাদেরই দিকে। কুটুনা জাপানি জানে, সে জিজ্ঞেস করল, তোমার নাম কী?

সেইজি বলল ছেলেটা।

এখানে কেন এসেছ?

ইস্কুল যাচ্ছি।

কুট্‌না ছাড়বার পাত্র নয়। বলল, তা হলে রাস্তা ছেড়ে ঝোপের দিকে যাচ্ছিলে কেন?

ছেলেটি চুপ।

ইতিমধ্যে কেনসলি ডানদিকে একটু এগিয়ে গিয়েছিল, সে কী জানি দেখে ডাক দিল, কাম হিয়ার, শঙ্কু।

কেন্‌সলি তার পায়ের কাছে ঘাসের দিকে চেয়ে আছে। আমি আর উইঙ্গাফিল্ড এগিয়ে দেখি, জমির খানিকটা অংশের ঘাস এবং সেইসঙ্গে একটা বুনো ফুলের গাছ চাপ লেগে মাটির সঙ্গে সিঁটিয়ে গেছে। দুপা এগোতেই চোখে পড়ল একটা চ্যাপিটানো প্রাণী—এক

বিঘাত লম্বা একটি গিরগিটি। গাড়ির চাকা বা অন্য কোনও ভারী জিনিস ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেলে এরকমভাবে পিষে যাওয়া স্বাভাবিক।

এবার কেনসিলি কুটুনার দিকে ফিরে বলল, আস্ক হিম ইফ হি ওয়াজ লুকিং ফর এ বল।

ছেলেটি এবার আর জবাব এড়াতে পারল না। সে বলল, গতকাল ইস্কুল থেকে ফেরার পথে সে একটা ধাতুর বল দেখেছিল এই পার্কে একটা ঝোপের পিছনে। কাছে যেতেই বলটা গড়িয়ে দূরে চলে যায়। অনেক ছোটাছুটি করেও সে বলটার নাগাল পায়নি। বিকেলে বাড়ি ফিরে টেলিভিশনে জানতে পারে যে, ঠিক ওইরকম একটা বলের সন্ধান দিতে পারলে পাঁচ লক্ষ ইয়েন পুরস্কার পাওয়া যাবে। তাই সে গতকাল রাত্রেও টর্চ নিয়ে বলটা খুঁজেছে, কিন্তু পায়নি।

আমরা ছেলেটিকে বোঝালাম যে, এই পার্কেই যদি বলটা পাওয়া যায় তা হলে আমরা তাকে পুরস্কার পাইয়ে দেব, সে নিশ্চিন্তে ইস্কুল যেতে পারে। ছেলেটি আশ্বস্ত হয়ে তার আবার খোঁজা শুরু করলাম। যে যন্ত্রটা পাবে, সে অন্যদের হাঁক দিয়ে জানিয়ে দেবে।

পায়েহাঁটা পথ ছেড়ে গাছপালা ঝোপঝাড়ের দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। কম্পু যদি সত্যিই সচল হয়ে থাকে তা হলে তাকে পেলেও সে ধরা দেবে কি না জানি না। তার উপরে তার যদি মানুষের উপর আক্রোশ থেকে থাকে তা হলে যে সে কী করতে পারে তা আমার অনুমানের বাইরে।

চতুর্দিকে দৃষ্টি রেখে মিনিটপাঁচেক চলার পর এক জায়গায় দেখলাম দুটো প্রজাপতি মাটিতে পড়ে আছে; তারমধ্যে একটা মৃত, অন্যটার ডানায় এখনও মৃদু স্পন্দন লক্ষ করা যাচ্ছে। গত কয়েক মিনিটের মধ্যে কোনও একটা ভারী জিনিস তাদের উপর দিয়ে চলে গেছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

www.bengaliebook.com

আমি এক পা এক পা করে অতি সন্তপণে এগোতে শুরু করেছি, এমন সময় একটা তীক্ষ্ণ শব্দ শুনে আমাকে থমকে যেতে হল।

শব্দটা শিসের মতো এবং সেটাকে লিখে বোঝাতে গেলে তার বানান হবে কি-য়ে দীর্ঘ ঊ।

আমি শব্দের উৎস সন্ধানে এদিক ওদিক চাইতে আবার শোনা গেল–

কূ– !

এবারে আন্দাজ পেয়ে শব্দ লক্ষ্য করে বা দিকে এগিয়ে গেলাম। এ যে কম্পুর গলা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আর ওই কু শব্দের একটাই মানে হতে পারে; সে আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে।

বেশি দূর যাবার দরকার হল না। একটা জেরেনিয়াম গাছের পিছনে সূর্যের আলো এসে পড়েছে কম্পপুর দেহে। সে এখন অনড়। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ওই কু শব্দই বোধহয় অন্য তিনজনকেও জানিয়ে দিয়েছে কম্পুর অস্তিত্ব। তিনজনেই তিনদিক থেকে ব্যস্তভাবে এগিয়ে এল আমার দিকে। এই গাছপালার পরিবেশে মসৃণ ধাতব গোলকটিকে ভারী অস্বাভাবিক লাি‌িগছিল দেখতে। কম্পপুর চেহারায় সামান্য পরিবর্তন হয়েছে কি? সেটা তার গা থেকে ধুলো মাটি আর ঘাসের টুকরো ঝেড়ে না ফেলা পর্যন্ত বোঝা যাবে না।

ওয়ান থ্রি ওয়ান থ্রি ওয়ান থ্রি সেভন।

কেনসিলি মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে কম্পুকে সক্রিয় করার মন্ত্রটা আওড়াল। কম্পু বিকল হয়েছে কি না জানার জন্য আমরা সকলেই উদগ্রীব।

সম্রাট নেপোলিয়ন কোন কোন যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন?

প্রশ্নটি করল। উইঙ্গাফিল্ড। ঠিক এই প্রশ্নটাই সেদিন ডিমনস্ট্রেশনে এক সাংবাদিক করেছিল কম্পপুকে, আর মুহুর্তের মধ্যে নির্ভুল জবাব দিয়েছিল আমাদের যন্ত্র।

কিন্তু আজ কোনও উত্তর নেই। আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি, বুকের ভিতরে একটা গভীর অসোয়াস্তির ভাব দানা বাঁধছে। উইঙ্গাফিল্ড গোলকের আরও কাছে মুখ এনে আবার প্রশ্নটি করল।

কম্পু, সম্রাট নেপোলিয়ন কোন কোন যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন?

এবারে উত্তর এল। উত্তর নয়, পালটা প্রশ্ন—তুমি জান না?

উইঙ্গফিল্ড হতভম্ব। কুটুনার মুখ হাঁ হয়ে গেছে। তার চাহনিতে বিস্ময়ের সঙ্গে যে আতঙ্কের ভাবটা রয়েছে সেটা কোনও অলৌকিক ঘটনার সামনে পড়লেই মানুষের হয়।

যে কারণেই হোক, কম্পু আর সে কম্পু নেই। মানুষের দেওয়া ক্ষমতাকে সে কোনও অজ্ঞাত উপায়ে অতিক্রম করে গেছে। আমার ধারণা, তার সঙ্গে এখন কথোপকথন সম্ভব। আমি প্রশ্ন করলাম–

তোমাকে কেউ নিয়ে এসেছে, না তুমি নিজে এসেছ?

নিজে।

এবারে কুটুনা প্রশ্ন করল। তার হাত পা কাঁপছে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

কেন এলে?

উত্তর এল। তৎক্ষণাৎ–

টু প্লে।

খেলতে? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম। আমি।

উইঙ্গফিল্ড আর কেনসলি মাটিতে বসে পড়েছে।

এ চাইল্ড মাস্ট প্লে।

এসব কী বলছে আমাদের যন্ত্র? আমরা চারজনে প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলাম—শিশু? তুমি শিশু?

তোমরা শিশু, তাই আমি শিশু।

অন্যেরা এই উত্তরে কী ভাবল জানি না, কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম কম্পু কী বলতে চাইছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও স্বীকার করতেই হবে যে, মানুষ যত না জানে, তার চেয়ে জানে না। অনেক বেশি। এই যে গ্র্যাভিটি বা অভিকর্ষ, যেটার প্রভাব সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে

মানুষের কাছে রহস্যই রয়ে গেছে। সেই হিসেবে আমরাও শিশু বই কী!

এখন কথা হচ্ছে কম্পপুকে নিয়ে কী করা যায়। যখন দেখা যাচ্ছে তার মন বলে একটা পদার্থ আছে, তখন তাকেই জিজ্ঞেস করা উচিত। বললাম, তোমার খেলা শেষ?

শেষ। বয়স বাড়ছে।

এখন কী করবে?

ভাবব।এখানেই থাকবে, না আমাদের সঙ্গে যাবে?

যাব।

গেস্টহাউসে পৌঁছেই মাৎসুয়েকে ডেকে পাঠালাম। তাকে বোঝালাম যে, এই অবস্থায় আর কম্পুকে ইনস্টিটিউটে রাখা যায় না, কারণ সর্বক্ষণ তার দিকে নজর রাখা দরকার। অথচ কম্পুর এই অবস্থাটো প্রচার করাও চলে না।

শেষ পর্যন্ত মাৎসুয়েই স্থির করল পন্থা। কম্পপুকে তৈরি করার আগে পরীক্ষা করার জন্য ওরই সাইজে দুটো অ্যালুমিনিয়ামের গোলক তৈরি করা হয়েছিল, তারই একটা ইনস্টিটিউটে রেখে দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হবে যে যন্ত্রটা উদ্ধার হয়েছে, আর আসল যন্ত্র থাকবে আমাদের কাছে এই গোস্টহাউসেই। এখানে বলে রাখি যে আমরা চার বৈজ্ঞানিক ছাড়া এখন আর কেউ এখানে নেই। দোতলা বাড়িতে ঘর আছে সবসুদ্ধ ষোলোটা। আমরা চারজনে দোতলার চারটে ঘরে রয়েছি, টেলিফোনে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগের বন্দোবস্ত রয়েছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মাৎসুয়ে একটি কাচের বাক্স পাঠিয়ে দিল আমার ঘরে। তারই মধ্যে তুলোর বিছানায় কম্পপুকে রাখা হয়েছে। অতি সাবধানে তার গা থেকে ধুলো মুছিয়ে দেবার সময় লক্ষ করলাম যে, তার দেহটা আর আগের মতো মসৃণ নেই। প্ল্যাটিনাম অত্যন্ত কঠিন ধাতু, কাজেই যন্ত্র যতই গড়াগড়ি করুক না কেন, এত সহজে তার মসৃণতা চলে যাওয়া উচিত না। শেষমেষ কম্পুকেই কারণ জিজ্ঞেস করলাম। কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে সে উত্তর দিল–

জানি না। ভাবছি।

বিকেলের দিকে মাৎসুয়ে আবার এল, সঙ্গে একটি টেপ রেকর্ডার। এই রেকর্ডারের বিশেষত্ব এই যে, মাইক্রোফোনে শব্দতরঙ্গ প্রবেশ করামাত্র আপনা থেকে রেকর্ডার চালু হয়ে যায়, আর শব্দ থামলেই বন্ধ হয়। রেকর্ডার কম্পুর সামনে রাখা রইল, ওটা আপনা থেকেই কাজ করবে।

মাৎসুয়ে বেচারি বড় অসহায় বোধ করছে। ইলেকট্রনিকসের কোনও বিদ্যাই তাকে এই পরিস্থিতিতে সাহায্য করছে না। তার ইচ্ছা ছিল গোলকাটাকে খুলে ফেলে তার ভিতরের সার্কিটগুলো একবার পরীক্ষা করে দেখে, কিন্তু আমি তাকে নিরস্ত করলাম। বললাম, ভিতরে গণ্ডগোল যাই হয়ে থাক না কেন, তার ফলে এখন যেটা হচ্ছে সেটাকে হতে দেওয়া উচিত। কম্পিউটার তৈরি করার ক্ষমতা মানুষের আছে, এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, কিন্তু কম্পু এখন যে চেহারা নিয়েছে, সেরকম যন্ত্র মানুষ কোনওদিনও তৈরি করতে পারবে কি না সন্দেহ। তাই এখন আমাদের কাজ হবে শুধু কম্পপুকে পর্যবেক্ষণ করা, এবং সুযোগ বুঝে তার সঙ্গে কথোপকথন চালানো।

সন্ধেবেলা আমার ঘরে বসে চারজনে কফি খাচ্ছি, এমন সময় কাচের বাক্সটা থেকে একটা শব্দ পেলাম। অতি পরিচিত রিনারিনে কণ্ঠস্বর। আমি উঠে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কিছু বললে?

উত্তর এল-জানি। বয়সের ছাপ।

অর্থাৎ সকালে তাকে যে প্রশ্ন করেছিলাম সেটার উত্তর এতক্ষণে ভেবে বার করেছে। কম্পু। প্ল্যাটিনামের রুক্ষতা হল বয়সের ছাপ।

তুমি কি বৃদ্ধ? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

না, বলল কম্পু, আই অ্যাম নাউ ইন মাই ইউথ।

অর্থাৎ এখন আমার জোয়ান বয়স।

আমাদের মধ্যে এক উইঙ্গফিল্ডের হাবভাবে কেমন যেন খটকা লাগছে আমার। মাৎসুয়ে যখন যন্ত্রটাকে খুলে পরীক্ষা করার প্রস্তাব করেছিল, তখন একমাত্র উইন্সফিল্ডই তাতে সায় দিয়েছিল। তার আপশোস যে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে কম্পিউটারটাকে তৈরি করা হয়েছিল। সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গেল। কম্পু নিজে থেকে কথা বলতে আরম্ভ করলেই

উইন্সফিল্ড কেন জানি উশখুশ করতে থাকে। কম্পুর এ হেন আচরণের মধ্যে যে একটা ভৌতিক ব্যাপার রয়েছে সেটা অস্বীকার করা যায় না; কিন্তু তাই বলে একজন বৈজ্ঞানিকের এরকম প্রতিক্রিয়া হবে কেন? আজ তো এই নিয়ে একটা কেলেঙ্কারিই হয়ে গেল। কম্পু আমার সঙ্গে কথা বলার মিনিটখানেকের মধ্যেই উইঙ্গাফিল্ড চেয়ার ছেড়ে গটগট করে কম্পপুর দিকে এগিয়ে গিয়ে আবার সেই একই প্রশ্ন করে বসল—সম্রাট নেপোলিয়ন কোন কোন যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন? ভাবটা যেন যন্ত্রের কাছ থেকে যান্ত্রিক উত্তরটা পেলেই সে আশ্বস্ত হবে।

কিন্তু উত্তর যেটা এল সেটা একেবারে চাবুক। কম্পু বলল, যা জানো তা জানতে চাওয়াটা মূর্খের কাজ।

এই উত্তরে উইঙ্গফিল্ডের যা অবস্থা হল সে আর বলবার নয়। আর সেইসঙ্গে তার মুখ থেকে যে কথাটা বেরোল তেমন কথা যে একজন প্রবীণ বৈজ্ঞানিকের পক্ষে উচ্চারণ করা সম্ভব এটা আমি ভাবতে পারিনি। অথচ দা্ষেটা উইঙ্গফিল্ডেরই; সে যে কম্পুর নতুন অবস্থাটা কিছুতেই মানতে পারছে না সেটা তার ছেলেমানুষি ও একগুঁয়েমিরই লক্ষণ।

আশ্চর্য এই যে, কম্পুও যেন উইঙ্গফিল্ডের এই অভদ্রতা বরদাস্ত করতে পারল না। পরিষ্কার কণ্ঠে তাকে বলতে শুনলাম, উইঙ্গাফিল্ড, সাবধান!

এর পরে আর উইঙ্গফিল্ডের এঘরে থাকা সম্ভব নয়। সে সশব্দে দরজা বন্ধ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কেনসিলি আর কুটুনা এর পরেও অনেকক্ষণ ছিল। কেনসলির ধারণা। উইঙ্গফিল্ডের মাথার ব্যামো আছে, তার জাপানে আসা উচিত হয়নি। সত্যি বলতে কী, আমাদের মধ্যে কাজ সবচেয়ে কম করেছে। উইঙ্গাফিল্ড। মেরিভেল জীবিত থাকলে এটা হত না, কারণ ইলেকট্রনিকসে সেও ছিল একজন দিকপাল।

আমরা তিনজনে আমারই ঘরে ডিনার সারলাম। কারুরই মুখে কথা নেই, কম্পুও নির্বাক। তিনজনেই লক্ষ করছিলাম যে, কম্পপুর দেহের রুক্ষতা যেন ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেড়ে চলেছে।

দুই বিজ্ঞানী চলে যাবার পর আমি দরজা বন্ধ করে বিছানায় এসে বসেছি, এমন সময় কম্পপুর কণ্ঠস্বরে টেপ রেকর্ডারটা আবার চলতে শুরু করল। আমি কাচের বাক্সটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কম্পুর গলার স্বর আর তেমন তীক্ষ্ণ নেই; তাতে একটা নতুন গাম্ভীর্য লক্ষ করা যাচ্ছে।

তুমি ঘুমোবে? প্রশ্ন করল কম্পু।

আমি বললাম, কেন জিজ্ঞেস করছি?

স্বপ্ন দেখ তুমি?—আবার প্রশ্ন।

তা দেখি মাঝে মাঝে। সব মানুষই দেখে।

কেন ঘুম? কেন স্বপ্ন?

দুরূহ প্রশ্ন করেছে কম্পুর্ণ। বললাম, সেটা এখনও সঠিক জানা যায়নি। ঘুমের ব্যাপারে একটা মত আছে। আদিম মানুষ সারাদিন খাদ্যের সন্ধানে পরিশ্রম করে রাত্রে কিছু দেখতে না পেয়ে চুপচাপ তার গুহায় বসে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়ত, তারপর দিনের আলো চোখে লাগলে তার ঘুম ভেঙে যেত। মানুষের সেই আদিম অভ্যোসটা হয়তো আজও রয়ে গেছে।

আর স্বপ্ন?

জানি না। কেউই জানে না।

আমি জানি।

www.bengaliebook.com

জান?

আরও জানি। স্মৃতির রহস্য জানি। মানুষ কবে এল জানি। মাধ্যাকর্ষণ জানি। সৃষ্টির গোড়ার কথা জানি।

আমি তটস্থ হয়ে চেয়ে আছি কম্পপুর দিকে। টেপ রেকর্ডার চলছে। বিজ্ঞানের কাছে যা রহস্য, তার সন্ধান কি কম্পু দিতে চলেছে?

না, তা নয়।

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে কম্পপু বলল, মানুষ অনেক জেনেছে। এগুলোও জানবে। সময় লাগবে। সহজ। রাস্তা নেই।

তারপর আবার কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর–কেবল একটা জিনিস মানুষ জানবে না। আমার জানতে হবে। আমি মানুষ নই। আমি যন্ত্র।

কী জিনিস?-আমি উদগ্রীব হয়ে প্ল্যাটিনাম গোলকটার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলাম।

কিন্তু কম্পু নির্বাক। টেপ রেকর্ডার থেমে আছে। মিনিটতিনেক এইভাবে থাকার পর সেটা আবার বলে উঠল–শুধু দুটো শব্দ রেকর্ড করার জন্য–

গুড নাইট।

১৮ই মার্চ

আমি হাসপাতালে বসে ডায়রি লিখছি। এখন অনেকটা সুস্থ। আজই বিকেলে ছাড়া পাব। এই বয়সে এমন একটা বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা হতে পারে সেটা ভাবতে পারিনি। কম্পপুর কথা না শুনে যে কী ভুল করেছি, সেটা এখন বুঝতে পারছি।

পরশু রাত্রে কম্পু গুড নাইট করার পর বিছানায় শুয়ে কয়েকমিনিটের মধ্যেই আমার ঘুম এসে গিয়েছিল। এমনিতে আমার খুব গাঢ় ঘুম হয়, তবে কোনও শব্দ হলে ঘুমটা ভাঙেও চট করে। কাজেই টেলিফোনটা যখন বেজে উঠল, তখন মুহূর্তের মধ্যেই আমি সম্পূর্ণ সজাগ। পাশে টেবিলে লুমিনাস ডায়ালওয়ালা ট্র্যােভলিং ক্লকে দেখলাম আড়াইটে।

টেলিফোনটা তুলে হ্যালো বলতে শুনলাম। উইঙ্গফিল্ডের গলা।

শঙ্কু, তোমার ঘুমের বড়ি একটা পাওয়া যাবে? আমার স্টক শেষ।

স্বভাবতই এতে আমার আপত্তির কোনও কারণ থাকতে পারে না। আমি বললাম। এক মিনিটের মধ্যে তার ঘরে গিয়ে আমি বড়ি দিয়ে আসব। উইঙ্গাফিল্ড বলল সে নিজেই আসছে।

আমি বড়ি বার করতে সঙ্গে সঙ্গেই দরজার সুরেলা ঘণ্টাটা বেজে উঠল। উঠে গিয়ে খুলতে যাব এমন সময় কম্পুর গলা পেলাম–

খুলো না।

আমি অবাক। বললাম, কেন?

উইঙ্গাফিল্ড অসৎ।

এসব কী বলছে কম্পু!

এদিকে দরজার ঘণ্টা আবার বেজে উঠেছে, আর তার সঙ্গে উইঙ্গফিল্ডের ব্যস্ত কণ্ঠস্বর—তুমি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি, শঙ্কু? আমি স্লিপিং পিলের জন্য এসেছি।

কম্পু তার নিষেধাজ্ঞা জানিয়ে চুপ করে গেছে।

www.bengaliebook.com

আমি দেখলাম দরজা না খোলায় অনেক মুশকিল। কী কৈফিয়ত দেব তাকে? যদি এই যন্ত্রের কথা সত্যি না হয়?

দরজা খুললাম, এবং খোলার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাতে আমি সংজ্ঞা হারালাম।

যখন জ্ঞান হল তখন আমি হাসপাতালে। আমার খাটের পাশে দাঁড়িয়ে আছে তিন বৈজ্ঞানিক-কুট্না, কেনসিলি আর মাৎসুয়ে। তারাই দিল আমাকে বাকি ঘটনার বিবরণ।

আমাকে অজ্ঞান করে উইন্সফিল্ড কম্পুকে দুভাগে ভাগ করে বগলদাবা করে নিজের ঘরে চলে যায়। তারপর সুটকেসের মধ্যে কম্পুর দু অংশ পুরে ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করে নীচে গিয়ে ম্যানেজারকে জানায় যে তাকে প্লেন ধরতে এয়ারপোর্টে যেতে হবে, তার জন্য যেন গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়। এদিকে গেস্টহাউসের এক ভৃত্য উইন্সফিল্ডের তিনটে সুটকেস নীচে নিয়ে আসার সময় তার একটা অস্বাভাবিক ভারী মনে হওয়ায় তার সন্দেহের উদ্রেক হয়, সে পাহারার জন্য মোতায়েন পুলিশের লোককে গিয়ে সেটা জানায়। পুলিশের লোক উইঙ্গাফিল্ডকে চ্যালেঞ্জ করলে উইঙ্গাফিল্ড মরিয়া হয়ে রিভলভার বার করে। কিন্তু পুলিশের তৎপরতার ফলে উইঙ্গফিল্ডকে হার মানতে হয়। সে এখন হাজতে আছে-সন্দেহ হচ্ছে ম্যাসাচুসেটসে তার সহকমী মেরিভেলের মৃত্যুর জন্য সে দায়ী হতে পারে। কম্পু তার আশ্চর্যক্ষমতার বলে তার স্বরূপ প্রকাশ করে দিতে পারে এই ভয়ে সে কম্পুকে নিয়ে সরে পড়ার চেষ্টা করেছিল, হয়তো এয়ারপোর্টে যাবার পথে কোথাও তাকে ফেলে দিত।

আমি সব শুনে বললাম, কম্পু এখন কোথায়?

মাৎসুয়ে একটু হেসে বলল, তাকে আবার ইনস্টিটিউটে ফিরিয়ে নিয়ে গেছি। গেস্টহাউসে রাখাটা নিরাপদ নয় সে তো বুঝতেই পারছি। সে তার কামরাতেই আছে। তাকে আবার জোড়া লাগিয়েছি।

সে কথা বলছে কি?

শুধু বলছে না, আশ্চর্য কথা বলছে। জাপানে ভূমিকম্প থেকে রক্ষা পাবার জন্য একরকম বাড়ির পরিকল্পনা দিয়েছে, যেগুলো জমি থেকে পাঁচ মিটার উপরে শূন্যে ভাসমান অবস্থায় থাকবে। বিজ্ঞান আজকাল যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তাতে এটা দশ বছরের মধ্যেই জাপান সরকার কার্যকরী করতে পারবে।

আরকিছু বলেছে?

তোমাকে দেখতে চায়, বলল। মাৎসুয়ে।

আমি আর থাকতে পারলাম না। মাথার যন্ত্রণা চুলোয় যাক, আমাকে ইনস্টিটিউটে যেতেই হবে।

পারবে তো? একসঙ্গে প্রশ্ন করল কুট্না ও কেন্সলি।

নিশ্চয়ই পারব।

আধঘণ্টার মধ্যে আবার সেই সুদৃশ্য কামরায় গিয়ে হাজির হলাম। আবার সেই স্ফটিকের স্তম্ভের উপর বসে আছে কম্পু। সিলিং থেকে তীব্র আলোকরশ্মি গিয়ে পড়েছে তার উপর, আর সেই আলোয় বেশ বুঝতে পারছি কম্পপুর দেহের মসৃণতা চলে গিয়ে এখন তার সবঙ্গে ফাটল ধরেছে। এই চারদিনে তার বয়স অনেক বেড়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

আমি কম্পপুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। কোনও প্রশ্ন করার আগেই তার শান্ত, গভীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম।

ঠিক সময়ে এসেছি। আর সাড়ে তিন মিনিটে ভূমিকম্প হবে। মৃদু কম্পন। টের পাবে, তাতে কারুর ক্ষতি হবে না। আর তখনই আমার শেষ প্রশ্নের উত্তর আমি পাব। সে উত্তর কোনও মানুষে পাবে না কোনওদিন।

এরপর আর কী বলা যায়। আমরা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে রইলাম। কম্পুর কয়েক হাত উপরেই ইলেকট্রিক ঘড়ির সেকেন্ডের কাঁটা এগিয়ে চলেছেটকটক করে।

এক মিনিট...দু মিনিট...তিন মিনিট...। অবাক চোখে দেখছি কম্পুর দেহের ফাটল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের জ্যোতিও বাড়ছে। শুধু বাড়ছে কি? তা তো নয়—তার সঙ্গে রঙের পরিবর্তন হচ্ছে যে!-এ তো প্ল্যাটিনামের রং নয়, এ যে সোনার রং!

পনেরো সেকেন্ড...বিশ সেকেন্ড...পঁচিশ সেকেন্ড...

ঠিক ত্রিশ সেকেন্ডের মাথায় পায়ের তলার মেঝেটা কেঁপে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে এক অপার্থিব বর্ণচ্ছটা বিকীর্ণ করে কম্পপুর দেহ সশব্দে খণ্ড খণ্ড হয়ে স্ফটিকস্তম্ভের উপর থেকে শ্বেতপাথরের মেঝেতে পড়ল, তার ভিতরের কলকবাজা চুর্ণবিচূর্ণ হয়ে ধুলোর মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, আর সেই ভগ্নস্তূপ থেকে একটা রক্ত হিম করা অশরীরী কণ্ঠস্বর বলে উঠল—

মৃত্যুর পরের অবস্থা আমি জানি!

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী ১৩৮৫

মহাকাশের দূত

২২শে অক্টোবর

ব্রেন্টউড, ১৫ই অক্টোবর

প্রিয় শঙ্কু, মনে হচ্ছে আমার বারো বছরের পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল পেতে চলেছি। খবরটা এখনও প্রচার করার সময় আসেনি, শুধু তোমাকেই জানাচ্ছি।

কাল রাত একটা সাঁইত্রিশে এপসাইলন ইন্ডি নক্ষত্রপুঞ্জের কোনও একটা অংশ থেকে আমার সংকেতের উত্তর পেয়েছি। মৌলিক সংখ্যার সংকেতের উত্তর মৌলিক সংখ্যাতেই এসেছে; সুতরাং এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে ছায়াপথের ওই অংশে কোনও একটি গ্রহ বা উপগ্রহে এমন প্রাণী আছে যারা আমাদের গণিতের ভাষা বোঝে এবং যারা পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে যোগস্থাপন করতে সক্ষম ও ইচ্ছুক।

তবে আশ্চর্য এই যে, পৃথিবী থেকে এই বিশেষ নক্ষত্রমণ্ডলের যে দূরত্ব তাতে বেতার তরঙ্গে সংকেত পৌঁছাতে লাগা উচিত দশ বছর। আমি প্রথম সংকেত পাঠাই আজ থেকে বারো বছর আগে; নিয়মমতো উত্তর আসতে লাগা উচিত ছিল আরও আট বছর। সেখানে মাত্র দু বছর লাগল কেন? তা হলে কি এই প্রাণী বেতারতরঙ্গের গতির চেয়েও অনেক বেশি দ্রুতগতিতে সংকেত পাঠানোর উপায় আবিষ্কার করেছে? এরা কি তা হলে মানুষের চেয়েও অনেক বেশি উন্নত?

যাই হোক, এই নিয়ে এখন আর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তোমাকে খবরটা দিলাম। কারণ আমার মতো তোমারও নিশ্চয়ই মিশরের প্যাপাইরাসের দৈববাণীর কথাটা মনে পড়ছে।

আশা করি ভাল আছে। নতুন খবর পেলেই তোমাকে জানাব। শুভেচ্ছা নিও।

ফ্রানসিস

ইংলন্ডের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ফ্রানসিস ফীল্ডিং হল আমার বাইশ বছরের বন্ধু। অন্য গ্রহে প্রাণী আছে কি না, বহু চেষ্টায় তার কোনও ইঙ্গিত না পেয়ে বিশ্বের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক যখন প্রায় হাল ছাড়তে বসেছে, ফীল্ডিং তখনও একা তার নিজের তৈরি ৯৫ ফুট ডায়ামিটারের রিসিভার তার নিজের বাড়ির পিছনের জমিতে বসিয়ে এক নাগাড়ে

বছরের পর বছর ছায়াপথের একটি বিশেষ অংশে ২১ সেন্টিমিটারে বেতার তরঙ্গে গাণিতিক সংকেত পাঠিয়ে চলেছে। আজ তার সফলতার ইঙ্গিত পেয়ে আমার মনটা আনন্দে ভরে উঠেছে।

ফ্রানসিস যে প্যাপাইরাসের দৈববাণীর কথা তার চিঠিতে উল্লেখ করেছে, সে বিষয়ে কিছু বলা দরকার।

উল্লেখ আছে এবং এদের সমাধি খুঁড়ে প্রত্নতত্ত্ববিদরা অনেক আশ্চর্য জিনিস পেয়েছেন। মৃত্যুর পোশাকপরিচ্ছদ বাসনকোসন ইত্যাদি বহু সামগ্রী পুরে দেওয়া হত সমাধির মধ্যে। এই সমাধির প্রবেশদ্বার বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলেও, ভিতরের জিনিসপত্র অনেক সময়ই লুট হয়ে যেত। ১৯২২ সালে বালক-রাজা তুতানখামেনের সমাধি আবিষ্কার হবার পরে যখন দেখা গেল যে প্রবেশদ্বারের সিলমোহরটি অক্ষত রয়েছে, তখন প্রত্নতত্ত্ববিদদের মধ্যে হইচই পড়ে গিয়েছিল। আজ কায়রো মিউজিয়মে গেলে দেখা যায় কী আশ্চর্য সব জিনিস ছিল এই সমাধিতে।

গত মার্চ মাসে আমেরিকান ধনকুবের ও শখের প্রত্নতত্ত্ববিদ গিডিয়ন মর্গেনস্টার্ন কায়রোতে বেড়াতে এসে খবর পান যে সেই দিনই সকালে স্থানীয় পুলিশ দুটি চোর ধরেছে, যাদের কাছে প্রাচীন মিশরের কিছু মূল্যবান জিনিস পাওয়া গেছে। তারা স্বীকার করেছে যে জিনিসগুলো এসেছে একটি মাস্তাবা বা সমাধি থেকে। নাইলের পুব পারে বেনি হাসানে একটি চুনা পাথরের টিলার গায়ে লুকোনো ছিল এই মাস্তাবার প্রবেশপথ।

মর্গেনস্টার্ন তৎক্ষণাৎ মিশর সরকারের অনুমতি নিয়ে নিজের খরচে একটি প্রত্নতাত্ত্বিক দল খাড়া করে এই মাস্তাবার ভিতরে খোঁড়ার কাজ শুরু করে দেয়। ধনরত্ন বিশেষ অবশিষ্ট না থাকলেও, একটি জিনিস পাওয়া যায় যেটা খুবই অদ্ভুত এবং মূল্যবান। সেটা হল একটা প্যাপাইরাসের দলিল।

প্যাপাইরাস গাছের আঁশ চিরে নিয়ে তাকে পানের তবকের মতো করে পিটিয়ে পাতলা করে কাগজের মতো ব্যবহার করত মিশরীয়রা। এতদিন যে সব প্যাপাইরাস পাওয়া গেছে। তার বেশির ভাগই রাজপ্রশস্তি, বা ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা বা স্থানীয় উপকথা। কিন্তু এবারের এই প্যাপাইরাসটির পাঠোদ্ধার করে জানা যায় সেটা কতকগুলি দৈববাণী, যাকে ইংরাজিতে বলে ওর্যাকলস। ফ্রান্সের দৈবজ্ঞ নষ্ট্রাডামুসের ওর্যাকলসের কথা অনেকেই জানে। আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে পদ্যে লেখা এক হাজার ভবিষ্যদ্বাণীর অনেকগুলোই পরবর্তী কালে আশ্চর্য ভাবে ফলে গেছে। লন্ডনের প্লেগ ও অগ্নিকাণ্ড, ফরাসি বিপ্লবে ষোড়শ লুই-এর গিলোটিনে মুণ্ডপাত, নেপোলিয়ন হিটলারের উত্থান পতন, এমনকী হিরোশিমা ধ্বংসের কথা পর্যন্ত নষ্ট্রাডামুস বলে গিয়েছিলেন।

মিশরের এই প্যাপাইরাসেও এই ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, কিন্তু সবগুলোই বিজ্ঞান সংক্রান্ত। হয়তো যাঁর সমাধি, তিনিই করেছেন। এইসব ভবিষ্যদ্বাণী। যিনিই করে থাকুন, তাঁর গণনায় স্তম্ভিত হতে হয়। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে বলা হয়েছে বাষ্পযান আকাশযান টেলিফোন টেলিভিশন আবিষ্কারের কথা; যান্ত্রিক মানুষের কথা বলা আছেঃ কম্পিউটারের বর্ণনা আছে, এক্স-রে ইনফ্রারেড রে আলট্রা ভায়োলেট-রের কথা বলা আছে। সবচেয়ে আশ্চর্য যা বলা হয়েছে—এবং যেটা সবে বৈজ্ঞানিকমহল মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেসেটা হল এই যে সৌরজগতে একমাত্র পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনও গ্রহে প্রাণী নেই। আমাদের সৌরজগতের বাইরে মহাকাশে আরও অসংখ্য সৌরজগৎ আছে যেখানে নাকি নানান গ্রহে নানারকম প্রাণী আছে, কিন্তু মানুষের মতো প্রাণী আছে কেবল আর একটিমাত্র গ্রহে। এই গ্রহের মানুষ পৃথিবীর মানুষের চেয়ে নাকি অনেক বেশি উন্নত। শুধু তাই নয়, বহুকাল থেকে নাকি পাঁচ হাজার বছরে একবার করে এই গ্রহের মানুষ পৃথিবীতে এসেছে, এবং পৃথিবীর মানুষকে সভ্যতার পথে বেশ খানিকটা এগিয়ে দিয়ে গেছে। প্যাপাইরাসের লেখক নিজেই নাকি এমন একটি গ্রহান্তরের মানুষের সামনে পড়েছিলেন, এবং তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষমতার জন্য নাকি এই ভিনগ্রহের মানুষই দায়ী।

এই আশ্চর্য প্যাপাইরাসটি মর্গেনস্টার্ন কায়রোর সংগ্রহশালার অধ্যক্ষকে বলেকয়ে আদায় করেছিলেন তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য। গত মে মাসে লন্ডনে একটি বিশেষ বৈঠকে পৃথিবীর কয়েকজন বাছাইকরা বৈজ্ঞানিকের সামনে মর্গেনস্টার্ন এই প্যাপাইরাসটি উপস্থিত করেন, এবং সে সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। প্যাপাইরাসটির পাঠোদ্ধার করেন বিখ্যাত মিশর-বিশেষজ্ঞ ডা. এডওয়ার্ড থার্নিক্রফট। জীর্ণ প্যাপাইরাসের তলার খানিকটা অংশ নেই। হয়তো সেখানে লেখকের নাম ছিল; কিন্তু সেটা এখন আর জানার উপায় নেই। তবু যেটুকু জানা গেছে তাও খুবই চমকপ্রদ। সন তারিখের যা উল্লেখ পাওয়া যায়, তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে লেখকের সঙ্গে ভিনগ্রহের প্রাণীর সাক্ষাৎ হয়েছিল। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে। ঠিক কবে এবং কোথায় আবার সেই গ্রহের প্রাণীর আবির্ভাব ঘটবে সে খবরটা মনে হয় পুঁথির লুপ্ত অংশে ছিল, এবং তাই নিয়ে মর্গেনস্টার্ন গভীর আক্ষেপ প্রকাশ করেন।

আমার সঙ্গে আমার জার্মান বৈজ্ঞানিক বন্ধু উইলহেলম ক্রোলও উপস্থিত ছিল এই সভায়। এমন সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোক আমি কমই দেখেছি। বক্তৃতার সময় আমার কানের কাছে মুখ এনে সে যে কতবার হামবাগ, ফ্রড, ধাপ্পাবাজ ইত্যাকার মন্তব্য করেছে তার হিসেব নেই। বক্তৃতার শেষে সে সরাসরি বলে বসল যে প্যাপাইরাসটা সে একবার হাতে নিয়ে দেখতে চায়। ক্রোলের যথেষ্ট খ্যাতি আছে বলেই বোধ হয় মর্গেনস্টার্ন অপমান হজম করে তার অনুরোধ রক্ষা করে। আমিও দেখলাম প্যাপাইরাসীটাকে খুব মন দিয়ে, কিন্তু সেটা জাল বলে মনে হল না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে–কীর্লিন্ডং যে গ্রহ থেকে তার বেতার সংকেতের উত্তর পেয়েছে, প্যাপাইরাসে কি সেই গ্রহের প্রাণীর কথাই বলা হয়েছে?

ব্যাপারটা আরও কিছু দূর না এগোলে বোঝার উপায় নেই।

২৬শে অক্টোবর

কাগজে আশ্চর্য খবর।

গিডিয়ন মর্গেনস্টার্ন আত্মহত্যা করেছে।

সে ইতিমধ্যে আবার কায়রোয় ফিরে গিয়েছিল; কেন তা খবরে বলেনি। যেটা বলেছে সেটা হল এই–

কায়রোতে পৌঁছানোর দুদিন পরেই সে হোটেলের ম্যানেজারের কাছে গিয়ে অভিযোগ জানায় যে তার রাত্রে ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে, কারণ ঘুম ভাঙলেই সে দেখতে পায় তার জানালায় একটা শকুনি বসে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। ম্যানেজার নাকি প্রথমে ব্যাপারটা হেসে উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাতে ফল ভাল হয়নি। মর্গেনস্টার্ন রেগে তার টুটি টিপে ধরেছিল। এদিকে সম্ভ্রান্ত অতিথি হিসেবে এহেন অবিশ্বাস্য অভিযোগ সত্ত্বেও মর্গেনস্টার্নের বিরুদ্ধে কোনও স্টেপ নিতে পারেনি ম্যানেজার। জানালাটা বন্ধ রাখার প্রস্তাব করাতে মর্গেনস্টার্ন বলেন যে হাঁপানির জন্য তিনি বন্ধ ঘরে শুতে পারেন না।

দুদিন অভিযোগ করার পর তৃতীয় দিন সকালে কফি নিয়ে রুমবয় মর্গেনস্টার্নের ঘরের বেল বারবার টিপে কোনও জবাব না পেয়ে শেষে মাস্টার কী দিয়ে দরজা খুলে দেখে ঘর খালি। ভদ্রলোকের স্যুটকেস রয়েছে, স্নানের ঘরে প্রসাধনের জিনিসপত্র রয়েছে, আর বেডসাইড টেবিলের উপর রয়েছে টিকিট লাগানো একটা ছোট্ট পার্সেল, আর একটা খোলা চিঠি। চিঠিতে লেখা শুধু একটি লাইন—নেখবেৎ আমায় বাঁচতে দিল না।

মিশরীয়রা সেই প্রাচীন যুগ থেকে নানারকম জন্তু জানোয়ার পাখি সরীসৃপকে দেবদেবীরূপে কল্পনা করে পূজা করে এসেছে। শেয়াল কুকুর সিংহ প্যাঁচা সাপ বাজপাখি বেড়াল ইত্যাদি সবই এর মধ্যে পড়ে। শকুনি ছিল তাদের কাছে নেখবেৎ দেবী।

খোঁজ নিয়ে জানা যায় মর্গেনস্টার্ন ভোররাত্তিরে হোটেল থেকে বেরিয়ে যায় দ্বাররক্ষককে বেশ ভাল রকম বিকশিশ দিয়ে। পুলিশ প্যাকেটটা খুলে দেখে তাতে কোনও কু পাওয়া যায় কি না। সেটা থেকে বেরোয় মর্গেনস্টার্নের মহামূল্য রিস্টওয়াচ, যেটা সে পাঠাতে চেয়েছিল নিউ ইয়র্কে তার এক ভাইপোর কাছে।

এখানে বলা দরকার যে মিশরের প্রাচীন সমাধি খোঁড়ার শোচনীয় পরিণামের নজির এটাই প্রথম নয়। তুতানখামেনের সমাধি খননের ব্যাপারে যিনি প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সেই লর্ড কারনারভনকেও কিছুদিনের মধ্যেই ভারী অদ্ভুতভাবে মরতে হয়েছিল। কায়রোর এক হোটেলেই তাঁর গালে এক মশা কামড়ায়। সেই কামড় থেকে সেপটিক ঘা, তার ফলে রক্তদৌর্বল্য থেকে নিউমোনিয়া এবং মৃত্যু।

কারনারভনের মৃত্যু যে সময়ে ঘটে, ঠিক সেই একই সময়ে ইংল্যান্ডে হ্যাম্পশায়ারে কারনারভনের পোষা কুকুরটি বিনা রোগে অকস্মাৎ মারা যায়। এই দুই মৃত্যুর কয়েক মাসের মধ্যে এই সমাধির কাজের সঙ্গে জড়িত আরও আটজন পর পর মারা যায় এবং কারুর মৃত্যুই ঠিক স্বাভাবিক ছিল না।

আমার জানতে ইচ্ছে করছে ব্রায়ান ডেক্সটার এখন কোথায় আছে। ডেক্সটার একজন তরুণ ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ফোটোগ্রাফার। সে মর্গেনস্টার্নের সঙ্গে ছিল এই সমাধি খননের ব্যাপারে। কথা ছিল কায়রোর কাজ শেষ হলে ও ভারতবর্ষে চলে আসবে। বছরতিনেক আগে একবার এসে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে; আমার চিঠিতেই ভারত সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ ডেক্সটারকে কালিবঙ্গনে গিয়ে হারাল্পা সভ্যতার নিদর্শনের কিছু ছবি তোলার অনুমতি দেয়। ও বলে রেখেছে। এবার এলে গিরিডিতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

২৮শে অক্টোবর

ফীল্ডিং-এর চিঠিতে চাঞ্চল্যকর খবর।

ছায়াপথ থেকে সংকেত এখন রীতিমতো স্পষ্ট, এবং তা শুধু মৌলিক সংখ্যায় নয়।

ফীল্ডিং-এর দৃঢ় বিশ্বাস এই গ্রহই হচ্ছে প্যাপাইরাসের গ্রহ। যেভাবে ঘন ঘন সংকেত আসছে, তাতে বোঝাই যাচ্ছে যে পৃথিবীর সঙ্গে যোগস্থাপন করতে পেরে এই নাম-না-জানা গ্রহের প্রাণী উল্লসিত হয়ে উঠেছে, অনেক দিনের পুরনো বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হলে যেমন হয়।

ফীল্ডিং-এর উত্তেজনা আমিও আমার শিরায় অনুভব করছি। গভীর আপশোঁস হচ্ছে প্যাপাইরাসের ওই হারানো শেষাংশের জন্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই গ্রহের প্রাণী আবার কবে পৃথিবীতে আসবে এবং কোথায় এসে নামবে, তার ইঙ্গিত এই হারানো অংশে ছিল। কালই রাত্রে আমার বাগানে ডেকচেয়ারে বসে ছিলাম অন্ধকারে, নিউটন আমার কোলে, আমার দৃষ্টি আকাশের দিকে। এমনিতেই অক্টোবরে উল্কাপাত হয় অন্য সময়ের তুলনায় একটু বেশি; কাল দেড় ঘণ্টায় সতেরোটা উল্কা দেখেছি, আর প্রতিবারই প্যাপাইরাসের গ্রহের কথা মনে হয়েছে।

৩০শে অক্টোবর

ফীল্ডিং-এর কাছ থেকে জরুরি টেলিগ্রাম—পত্রপাঠ চলে এসো কায়রো-তোমার জন্য হোটেল কার্ণাকে ঘর বুক করা হয়ে গেছে। আমি জানিয়ে দিয়েছি। ৩রা নভেম্বর পৌঁছোচ্ছি।

কিন্তু হঠাৎ কায়রো কেন?

ঈশ্বর জানেন।

৪ঠা নভেম্বর

আমিই কালই পৌঁছেছি, যদিও প্লেন ছিল তিন ঘণ্টা লেট। আমার মন বলছিল এয়ারপোর্টে এসে দেখব। শুধু কীর্লিন্ডং নয়, ক্রোলও এসেছে; কিন্তু সেইসঙ্গে যে

আরেকজন থাকবে, সেটা ভাবতে পারিনি। ইনি হলেন ব্রায়ান ডেক্সটার। ব্রায়ানকে দেখেই বুঝলাম যে তার ওপর ভারতবর্ষের সূর্যের প্রভাব পড়েছে, কারণ তার এত তামাটে রং আগে কখনও দেখিনি।

ব্রায়ান এবারও কালিবঙ্গন গিয়েছিল, আর সেখানে থাকতেই মর্গেনস্টার্নের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সোজা লন্ডনে চলে আসে। আত্মহত্যার বিবরণ শুনে সে নাকি খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিল, যদিও আমি জিজ্ঞেস করাতে বলল, অভিশাপ টিভিশাপে তার বিশ্বাস নেই। তার ধারণা মর্গেনস্টার্নের সানস্ট্রোক জাতীয় কোনও ব্যারামের সূত্রপাত হয়, এবং তার ফলে মাথাটা বিগড়ে যায়। ব্রায়ান নাকি বেনি হাসানের সমাধি খননের সময়ই লক্ষ করেছিল যে মর্গেনস্টার্ন রোদের তাপ একদম সহ্য করতে পারে না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে কি সে সত্যিই উৎসাহী ছিল? ব্রায়ান বলল, অগাধ টাকা থাকলে অনেক লোক নানারকম শখকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। তা ছাড়া খ্যাতির প্রতিও মর্গেনস্টার্নের একটা লোভ ছিল। শুধু বড়লোক হয়ে আর আজকাল আমেরিকায় বিশেষ কেউ নাম করতে পারে না। সবাই চায় একটা কোনও কীর্তি রেখে যেতে। হয়তো মর্গেনস্টার্ন চেয়েছিল। এই প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান ফিনান্স করে সে বেশ কিছুটা খ্যাতি লাভ করবে।

আমি আরও কয়েকটা প্রশ্ন করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ফীল্ডিং বাধা দিয়ে বলল বাকি কথা হোটেলে গিয়ে হবে।

লাঞ্চের পর কণাক হোটেলের দোতলার খোলা বারান্দায় বসে কফি খেতে খেতে বাকি কথা হল। সামনে নীল নদ বয়ে চলেছে, টুরিস্টদের জন্য নানারকম বোট সাজানো রয়েছে জেটিতে, রাস্তায় দেশবিদেশের বিচিত্র লোকের ভিড়।

প্রথমেই ব্রায়ান তার ক্যামেরার ব্যাগ থেকে একটা বড় খাম বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিল।

দেখো তো জিনিসটা তোমার চেনা কি না।

খুলে দেখি, আরে, এ যে সেই প্যাপাইরাসটার ফোটোগ্রাফ!

জিনিসটা পাওয়ামাত্র এটার ছবি তুলে রেখেছিলাম, বলল ব্রায়ান।—তুমি যে প্যাপাইরাসটা লন্ডনে দেখেছিলে সেটার সঙ্গে কোনও তফাত দেখছি কি?

দেখছি বই কী।—ছবিটা হাতে নিতেই তো তফাতটা লক্ষ করেছি। এটা সম্পূর্ণ প্যাপাইরাসটার ছবি, তলার অংশটুকুও বাদ নেই।

ব্রায়ানকে জিজ্ঞেস করাতে সে ব্যাপারটা বললা।—

আসলে প্যাপাইরাসটার অবস্থা এমনিতেও ছিল বেশ জীর্ণ। পাঁচ হাজার বছর পাকানো অবস্থায় সমাধিকক্ষের এক কোণে পড়ে ছিল। এটা আমিই প্রথম পাই। আর পেয়ে প্রথমেই সাবধানে পাক খুলে মাটিতে ফেলে চার কোণে চারটে পাথর চাপা দিয়ে কয়েকটা ফ্ল্যাশলাইট ফোটো তুলে নিই। মর্গেনস্টার্ন এটা দেখেই বগলদাবা করে। আমি ওকে বলি সে যেন খুব সাবধানে জিনিসটা হ্যান্ডল করে। মুখে হ্যাঁ বললেও বেশ বুঝতে পারি ও এসব জিনিসের মূল্য ঠিক বোঝে না।

ও প্রথমেই যায় থার্নিক্রফটের কাছে। থার্নিক্রফট লেখাটা পড়ে দেবার পর মর্গেনস্টার্ন সোজা চলে যায় কায়রো মিউজিয়ামের কিউরেটর মি. এহেব্রাহিমের কাছে। আমার মনে আছে সেদিন খুব ঝড় ছিল; বালিতে শহর অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। আমার বিশ্বাস তখনই প্যাপাইরাসের শেষ অংশটা খোয়া গেছে।

ওয়েল, শঙ্কু?

ক্রোল এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, যদিও তার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনার ভাব প্রথম থেকেই লক্ষ করছি। ক্রোল হায়রোগ্লিফিক্সের ভাষা ভালভাবেই জানে, এবং বুঝতেই পারছি সে ইতিমধ্যে শেষ অংশটির মানে বার করে ফেলেছে, আর তাই এই উত্তেজনা।

আমি বললাম, এই অংশতে তো দেখছি দৈবজ্ঞের নাম রয়েছে-মেনেম্বু। আর অন্য গ্রহ থেকে যারা আসবে, তারা কবে আসবে এবং কোথায় এসে নামবে, তাও দেওয়া রয়েছে।

ফীল্ডিং বলল, সেই জন্যেই তোমাকে টেলিগ্রাম করে আনালাম। অমাবস্যা তো আর দুদিন পরেই, আর দৈবজ্ঞ যদি সনে ভুল না করে থাকেন–

আমি বাধা দিয়ে বললাম, এতে যে ধূমকেতুর উল্লেখ আছে তার থেকেই তো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আমি একবার হিসাব করে দেখেছিলাম, ছিয়াত্তর বছর পর পর যদি হ্যালির ধূমকেতু আসে, তা হলে আজ থেকে ঠিক পাঁচহাজার বছর আগে একবার সেই ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটেছিল-অর্থাৎ ৩০২২ বিসি-তে।

ক্রোল প্রচণ্ড উৎসাহের সঙ্গে সায় দিয়ে বলল, আমারও হিসেব তোমার সঙ্গে মিলছে। প্যাপাইরাসে বলছে দৈবজ্ঞের যখন অন্য গ্রহের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তখন আকাশে ধূমকেতু ছিল। সেটা ৩০২২ হওয়া এই জন্যই সম্ভব কারণ তখন ঈজিপ্টে মেনিসের রাজত্বকাল, আর সেটাকেই বলা হয় ঈজিপ্টের স্বর্ণযুগের শুরু। সব মিলে যাচ্ছে, শঙ্কু!

ডেক্সটার বলল, কিন্তু এর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা চলে কি? এক-আধা বছরও কি এদিক ওদিক হতে পারে না?

ফ্রান্ডিং তার চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে বলল, আমার ধারণা, এতে কোনও ভুল নেই, কারণ আমি এখানে আসার আগের দিনই এপসাইলন ইন্ডি থেকে সংকেত পেয়েছি। তাতে বলা হয়েছে যে আগামী অমাবস্যায় তাদের দূত পৃথিবীতে এসে পৌঁছাচ্ছে, এবং তারা যেখানে নামবে সে জায়গাটা হল এখান থেকে আন্দাজ দুশো কিলোমিটার পশ্চিমে।

তার মানে মরুভূমিতে? ডেক্সটার প্রশ্ন করল।

সেটাই স্বাভাবিক নয় কি?

কিন্তু কী ভাষায় পেলে এই সংকেত? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

টেলিগ্রাফের ভাষা, বলল ফল্ডিং, মর্স।

তার মানে পৃথিবীর সঙ্গে তারা যোগ রেখে চলেছে এই গত পাঁচ হাজার বছর?

সেটা আর আশ্চর্য কী, শঙ্কু। ভুলে যেও না তাদের সভ্যতা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি অগ্রসর।

তা হলে তো তারা ইংরেজিও জানতে পারে।

কিছুই আশ্চর্য নয়। তবে আমি ইংরেজ কি না সেটা হয়তো তাদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না, তাই তারা মর্স কোড ব্যবহার করেছে।

তা হলে আমাদের গন্তব্যস্থল হল কোথায়? আমি প্রশ্ন করলাম।–তারা তো আর এই হোটেলে এসে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে না।

ফীল্ডিং হেসে বলল, না, সেটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। আমরা যাব বাওয়িতি–এখান থেকে দুশো ত্রিশ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে। রাস্তা আছে, তবে তাকে হাইওয়ে বলা চলে না। অবিশ্যি তাতে কোনও অসুবিধা হবে না। ক্রোলের গাড়িটা তো তুমি দেখেছ।

তা দেখেছি। এয়ারপোর্ট থেকে ক্রোলের গাড়িতেই এসেছি। বিচিত্র গাড়ি-যেন একটি ছোটখাটো চলন্ত হোটেল। সেইসঙ্গে মজবুতও বটে। অটোমোটেল নামটা ক্রোলেরই দেওয়া।

ডা. থার্নিক্রফটও আসছেন কাল সকালে, বলল ফ্রাল্ডিং, তিনিও হবেন আমাদের দলের একজন।

এ খবরটা জানা ছিল না। তবে থার্নিক্রফটের আগ্রহের কারণটা স্পষ্ট। হাজার হোক তিনিই তো প্যাপাইরাসের পাঠোদ্ধার করেছেন।

তোমার অ্যানাইহিলিনটা সঙ্গে এনেছ তো? ক্রোল জিজ্ঞেস করল।

আমি জানিয়ে দিলাম যে এই ধরনের অভিযানে সেটা সব সময়ই সঙ্গে থাকে। আমার তৈরি এই আশ্চর্য পিস্তলের কথা এরা সকলেই জানে। যত বড় এবং যত শক্তিশালী প্রাণীই হোক না কেন, তার দিকে তাগ করে এই পিস্তলের ঘোড়া টিপলেই সে প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সবসুদ্ধ বার দশেক চরম সংকটের সামনে পড়ে আমাকে এই অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়েছে। প্যাপাইরাসের বিবরণ থেকে এই ভিনগ্রহের প্রাণীকে হিংস্র বলে মনে হয় না, কিন্তু এবার যারা আসবে তাদের অভিপ্রায় যখন জানা নেই, তখন আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকলে ক্ষতি কী?

আমরা চার জনে পরস্পরের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে রইলাম যেন আমাদের এই আসন্ন অভিযানের কথা ঘুণাক্ষরেও কেউ না জানে।

আমরা উঠে যে যার ঘরে যাবার তোড়জোড় করছি, এমন সময় দেখি হোটেলের ম্যানেজার মি. নাহুম আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। এখানে বলে রাখি। যে এই কাণকি হোটেল থেকেই মর্গেনস্টার্ন উধাও হয়েছেন, এবং এই মি. নাহুমকেই মর্গেনস্টার্নের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল।

নাহুম জানালেন যে মর্গেনস্টার্নের আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। কাজেই ধরে নিতে হয় মর্গেনস্টার্ন শহর থেকে বেরিয়ে গিয়ে নাইলের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছেন।

আর কোনও শকুনাটকুনি এসে কোনও ঘরের জানলায় বসছে না তো? ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন করল ক্রোল।

জিভ কাটার অভ্যাস ঈজিপসীয়দের থাকলে অবশ্যই মি. নাহুিম জিহ্বা দংশন করতেন। তার বদলে তিনি আমাদের কাছে এগিয়ে এসে ফিসফিস করে বললেন, আপনাদের বলতে দ্বিধা নেই–আমাদের হোটেলের ত্রিসীমানার মধ্যে কেউ কোনওদিন শকুনি দেখেছে বলে শুনিনি। তবে বেড়াল কুকুর যে এক আধটা দেখা যাবে না তার ভরসা দিতে পারছিনা, হে হে।

আমরা ঠিক করেছি। কাল লাঞ্চের পরেই রওনা দেব। কী আছে কপালে জানি না, তবে আমি মনে করি ঈজিপ্টে আসার মধ্যেই একটা সার্থকতা আছে। এখানে এসে দু মিনিট চুপ করে থাকলেই চারপাশের আধুনিক শহরের সব চিহ্ন মুছে গিয়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সেই প্রাচীন যুগের মিশর। ইমহোটেপ, আখেনাতন, খুফু, তুতানখামেনের দেশে এসে নামবে ছায়াপথের কোন এক অজ্ঞাত সৌরজগতের প্রাণী? ভাবতেও অবাক লাগে।

৫ই নভেম্বর

আজ মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দুটো ঘটনা আমাদের সকলকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। এখনও তার জের সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারিনি।

একটু ঘুরে আসব। গিরিডিতে রোজ ভোরে উশ্রীর ধারে বেড়ানোর অভ্যাসটা আমার বহুকালের।

ঘুম আমার আপনা থেকেই সাড়ে চারটেয় ভেঙে যায়। আজ কিন্তু ভাঙল স্বাভাবিক ভাবে নয়। আমার ঘরের দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কাই এই নিদ্রাভঙ্গের কারণ।

ব্যস্তভাবে উঠে জাপানে উপহার পাওয়া বেগুনি কিমোনোটা চাপিয়ে নিয়ে দরজাটা খুলে দেখি ডেক্সটার–তার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, দম ফেলছে যেন ম্যারাথন দৌড়ে এল!

www.bengaliebook.com

কী ব্যাপার?

এ স্নেক—এ মোক ইন মাই রুম!

কথাটা শেষ করে টলায়মান অবস্থায় ঘরে ঢুকে সে ধাপ করে আমার খাটে বসে পড়ল।

আমি জানি ডেক্সটারের ঘর আমার তিনটে ঘর পরে। বাকি দুজন রয়েছে আমাদের উপরের তলায়, তাই সে আমার কাছেই এসেছে।

ডেক্সটারকে আশ্বাস দিয়ে দৌড়ে প্যাসেজে গিয়ে হাজির হলাম।

মেঝেতে মিশরীয় নকশা করা কার্পেট বিছানো সুদীর্ঘ প্যাসেজের এমাথা থেকে ওমাথায় একটি প্রাণীও নেই। থাকার কথাও নয়, কারণ ঘড়ি বলছে আড়াইটে। যা করার আমাকেই করতে হবে।

সুটকেস থেকে অ্যানাইহিলিন পিস্তলটাি বার করে ছুটি দিলাম একশো ছিয়াত্তর নম্বর ঘরের দিকে। ডেক্সটারের কথায় যে পুরোপুরি বিশ্বাস হয়েছিল তা বলব না, তবে জরুরি অবস্থার জন্য তৈরি থাকা দরকার।

ঘরের দরজা হাট হয়ে আছে, ভিতরে ঢুকে বুঝলাম এ ঘর আর আমার ঘরের মধ্যে তফাত শুধু দেয়ালের ছবিতে।

বাঁয়ে চোখ ঘোরাতেই দেখলাম সাপটাকে। গোখুরো। খাটের পায়া বেয়ে মেঝোয় কার্পেটের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, অর্ধেক দেহ খাটের উপর। ভারতীয় গোখুরোর মতো অত মারাত্মক না হলেও, বিষধর তো বটেই। প্রাচীন যুগে এই সাােপকেও মিশরীয়রা পুজো করত। দেবী হিসেবে।

আমার পিস্তলের সাহায্যে নিঃশব্দে নাগদেবীকে নিশ্চিহ্ন করে ফিরে এলাম। আমার ঘরে। ডেক্সটার এখনও কাবু। মেনেফুর রুষ্ট আত্মার অভিশাপে যে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করেনি এই গোখুরো তার মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিয়েছে।

আমার মন অন্য কথা বলছে, তাই তরুণ ত্রস্ত প্রত্নতত্ত্ববিদকে আমার তৈরি নার্ভিগারের এক ফোঁটা জলে মিশিয়ে খাইয়ে দিয়ে তার পিঠ চাপড়ে দিলাম।

তাতেও অবিশ্যি পুরোপুরি কাজ হল না। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে, তার ঘরের আর কোথাও কোনও সাপ নেই সেটা দেখিয়ে দিয়ে তবে নিশ্চিন্তি।

ম্যানেজারের সঙ্গে একটা তুলাকালাম হয়ে যেত, কিন্তু সাপটা কোথায় গেল জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেওয়া মুশকিল হত বলে সেটা আর হল না। যেহেতু আজই আমরা হোটেল ছেড়ে চলে যাচ্ছি, তাই আর ব্যাপারটা নিয়ে ঘাঁটালাম না।

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল হোটেলের পিরামিড রুমে, ব্রেকফাস্টের সময়। থর্নিক্রফ্‌টের প্লেন এসে পৌঁছাবে ভোর ছটায়, সুতরাং তার হোটেলে পৌঁছে যাওয়া উচিত সাড়ে সাতটার মধ্যে। আটটায়, তখনও আমাদের প্রাতরাশ শেষ হয়নি, ম্যানেজার স্বয়ং এসে খবর দিলেন যে থার্নিক্রফট এসে পৌঁছেছেন ঠিকই, কিন্তু অ্যাম্বুল্যান্সে।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় একটি আঘাত পেয়ে থার্নিক্রফট সংজ্ঞা হারান। দুজন সুইস টুরিস্ট পুলিশের সাহায্যে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করে। ব্যাপারটা রাহাজানি তাতে সন্দেহ নেই। কারণ তিনশো পাউন্ড সমেত থার্নিক্রফটের ওয়ালেটটি লোপ পেয়েছে।

সৌভাগ্যক্রমে আঘাত গুরুতর হয়নি। ভয় ছিল থার্নিক্রফটকে হয়তো দল থেকে বাদ দিতে হবে, কিন্তু প্রস্তাবটা উনি কানেই নিলেন না। বললেন ওঁর যে কোনও রকম দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তার জন্য উনি একরকম প্রস্তুতই ছিলেন। কারণ জিজ্ঞেস করাতে বললেন, জানি তোমাদের যুক্তিবাদী মন এসব মানতে চায় না, আমি কিন্তু অভিশাপে সম্পূর্ণ

বিশ্বাসী। প্রাচীন মিশর সম্বন্ধে তোমাদের যদি আমার মতো পড়াশুনা থাকত, তা হলে তোমরাও আমার সঙ্গে একমত হতে।

৫ই নভেম্বর, বিকেল পৌনে তিনটে

আমরা আর আধা ঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ব। ইতিমধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেছে সেটা লিখে রাখছি।

মিনিট পনেরো আগে মি. নাহুম একটি আজব জিনিস। এনে দেখালেন আমাকে।

জিনিসটা একটা ছোট্ট পকেট ডায়েরি। বোঝাই যায় সেটা বেশ কিছুকাল জলমগ্ন অবস্থায় ছিল। ভিতরে লেখা যা ছিল তা সব ধুয়ে মুছে গেছে; ছাপা অংশগুলোও আর পড়া যায় না। শুধু একটা কারণে জিনিসটার মালিকানা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না; সেটা হল ডায়েরির ভিতরে পাতার সঙ্গে জেমক্লিপ দিয়ে আটকানো একটা ফোটোগ্রাফ। বিবর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, যার ফোটো তাকে চিনতে অসুবিধা হয় না। লন্ডনের সেই সভায় এনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ইনি মর্গেনস্টার্নের স্ত্রী মিরিয়াম। কায়রো থেকে প্রায় এগারো কিলোমিটার দূরে নাইলের ধারে একটি জেলের বাড়ি থেকে পুলিশ এই ডায়েরিটা উদ্ধার করেছে। জেলের একটি সাত বছরের ছেলে নদীর ধারে কাদার মধ্যে এটাকে পায়।

মর্গেনস্টার্ন যতই বেআক্কেলি করে থাকুক না কেন, এই ডায়েরিটা দেখে তার জন্য কিছুটা অনুকম্পা বোধ না করে পারলাম না।

ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। নিশ্চয়ই ফীল্ডিং।

৫ই নভেম্বর, সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা

বাওয়িতি যাবার পথে কায়রো থেকে তিরাশি কিলোমিটার দক্ষিণে অল ফাইয়ুমের একটা সরাইখানায় বসে কফি আর আখরোট খাচ্ছি আমরা পাঁচজনে।

থার্নিক্রফট অনেকটা সুস্থ। ডেক্সটার চুপ মেরে গেছে। তার দিকে দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে, এবং তাকে বলা হয়েছে সে যেন আমাদের ছেড়ে কোথাও না যায়। ক্রোল তার ক্যামেরার সরঞ্জাম সাফ করছে। তিনটে মতুন মডেলের লাইকা। তার একটায় বিরাট টেলিফোটো লেনাস। মহাকাশযানের প্রথম আবির্ভাব থেকে শুরু করে সমস্ত ঘটনা সে ক্যামেরায় তুলে রাখবে। কয়েক বছর থেকে আনআইডেনটিফাইড ফ্লাইং অবজেক্ট বা অনির্দিষ্ট উড়ন্ত বস্তু নিয়ে যে পৃথিবীর বেশ কিছু লোক মাতামাতি করছে, তাদের সম্বন্ধে ক্রেগলের অবজ্ঞার শেষ নেই। বলল, এইসব লোকের তোলা বহু ছবি পত্রপত্রিকায় বেরিয়েছে, কিন্তু ধাপ্পাটা ধরা পড়ে। এতেই যে, সব ছবিতেই উড়ন্ত বস্তুটিকে দেখানো হয় একটি চাকতির মতো। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? অন্য গ্রহের মহাকাশযান হলেই কি তার চেহারা চাকতির মতো হবে?

ফীল্ডিং আমাদের দিকে চোখ টিপে প্রশ্ন করল, ধরে যদি আমাদের এই মহাকাশযানটিও চাকতির মতো দেখতে হয়?

তা হলে সমস্ত সরঞ্জাম সমেত আমার এই তিনটে ক্যামেরাই নাইলের জলে ছুড়ে ফেলে দেবী, বলল ক্রোল, চাকতি দেখার প্রত্যাশায় আসিনি এই বালি আর পাথরের দেশে।একটা চিন্তা কাল থেকেই আমার মাথায় ঘুরছে, সেটা আর না বলে পারলাম না। তোমরা ভেবে দেখেছি কি, যে এই পাঁচ হাজার বছরের হিসেবে ক্রমশ পিছিয়ে গেলে বেশ কয়েকটা আশ্চর্য তথ্য বেরিয়ে পড়ে? পাঁচ হাজার বছর আগে ঈজিপ্টের স্বর্ণযুগের শুরু সে তো দেখেইছি। আরও পাঁচ হাজার পিছেলে দেখছি মানুষ প্রথম কৃষিকার্য শুরু করেছে, নিজের চেষ্টায় ফসল উৎপাদন করছে। আরও পাঁচ হাজার পিছিয়ে গেলে দেখছি মানুষ প্রথম হাড় ও হাতির দাঁতের হাতিয়ার, বর্শার ফলক, মাছের বঁড়িশি ইত্যাদি তৈরি করছে, আবার সেইসঙ্গে গুহার দেয়ালে ছবি আঁকছে। ত্রিশ হাজার বছর আগে দেখছি মানুষের মস্তিষ্কের আকৃতি বদলে গিয়ে আজকের মানুষের মতো হচ্ছে।...পৃথিবীর প্রাচীন ইতিহাসের অনেক অধ্যায় আজও আমাদের কাছে অস্পষ্ট, কিন্তু এই পাঁচের হিসেবে যতটুকু ধরা পড়ছে সেটা আশ্চর্য নয় কি?

আমার কথায় সবাই সায় দিল।

ক্রোল বললা হয়তো এদের কাছে পৃথিবীর ইতিহাসের একটা ধারাবাহিক বিবরণ আছে– একেবারে মানুষের আবির্ভাব থেকে শুরু করে ঈজিপ্টের স্বর্ণযুগের শুরু অবধি।

তা তো থাকতেই পারে, বলল ফল্ডিং।–এরা যদি জিজ্ঞেস করে আমরা কী চাই, তা হলে ওই দলিলের কথাটাই বলব। ওটা বাগাতে পারলে আর কোনও কিছুর দরকার আছে কি?

কফি আর আখরোটের দাম চুকিয়ে দিয়ে আমরা উঠে পড়লাম।

আজি অমাবস্যা।

বাকি পথটা আকাশের দিকে চোখ রেখে চলতে হবে।

৬ই নভেম্বর, সকাল সাড়ে ছটা

বিজ্ঞানের সব শাখা প্রশাখায় আমার অবাধ গতি বলে আমি নিজেকে সব সময় বৈজ্ঞানিক বলেই বলে এসেছি, কোনও একটা বিষয়ে বিশেষজ্ঞতার দাবি করিনি। আমাদের দলের বাকি চারজনেই বিশেষজ্ঞের পর্যায়ে পড়ে, যদিও বয়স, অভিজ্ঞতা, কীর্তি বা খ্যাতিতে সকলে সমান নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে কী, ফ্রান্ডিং, ক্রোল, থার্নিক্রফট, ডেক্সটার, আমি–এদের কারুর মধ্যেই এখন আর কোনও তারতম্য ধরা পড়ছে না। মহাসাগরের তুলনায় টলির নালা আর গঙ্গার মধ্যে খুব একটা তফাত আছে কি?

কালকের অবিস্মরণীয় ঘটনাগুলো পর পর গুছিয়ে বলার চেষ্টা করছি।

অল্ ফাইয়ুমের সরাইখানা থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে রুক্ষ মরুপ্রান্তরের মধ্যে দিয়ে মিনিটদশেক চলার পরেই একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে, যেটার বিষয় বলার আগে ক্রোলের অটোমোটেলের ভিতরটা কীরকম সেটা একটু বলা দরকার।

সামনে ড্রাইভারের পাশে দুজনের বসার জায়গা। তার ঠিক পিছনেই একটা সরু প্যাসেজের একদিকে একটা বাথরুম ও একটা স্টোররুম, আর অন্যদিকে একটা কিচেন ও একটা প্যানট্রি। প্যাসেজ থেকে বেরিয়েই দুদিকে দুটো করে বাঙ্ক-আপার ও লোয়ার। একজন অতিরিক্ত লোক থাকলে সে অনায়াসে দুদিকের বাঙ্কের মাঝখানে মেঝেতে বিছানা পেতে শুতে পারে।

গাড়ি চালাচ্ছিল ক্রোল, আর আমি বসে ছিলাম। তার পাশে। পিছনে, লোয়ার বাঙ্কের একটায় বসে ছিল থার্নিক্রফটু, আরেকটায় ফাল্ডিং আর ডেক্সটার।

আমরা যখন বেরিয়েছি, তখন পৌনে সাতটা। আকাশে তখনও আলো রয়েছে। পথের দুধারে বালি আর পাথর। জায়গাটা মোটামুটি সমতল হলেও মাঝে মাঝে চুনা পাথরের টিলা বা টিলার সমষ্টি চোখে পড়ছে, তার মধ্যে এক একটা বেশ উঁচু।

প্রচণ্ড উৎকণ্ঠার মধ্যেও মাঝে মাঝে আমাদের হোটেলের ম্যানেজার মি. নাহুমের মুখটা মনে পড়ছে, আর মনটা খচ খচ করে উঠছে। ভদ্রলোকের অতি অমায়িক আচরণটা আমার কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হয়েছে-যেন তিনি কোনও একটা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

আকাশে সবে দু-একটা তারা দেখা দিতে শুরু করেছে, এমন সময় একটা আর্তনাদ, আর তার পরমুহূর্তেই একটা বিস্ফোরণের শব্দে স্টিয়ারিং-এ ক্রোলের হাতটা কেঁপে গিয়ে গাড়িটা প্রায় রাস্তার ধারে একটা খানায় পড়ছিল।

দুটো শব্দই এসেছে আমাদের গাড়ির পিছন দিক থেকে।

জায়গা ছেড়ে রুদ্ধশ্বাসে প্যাসেজ দিয়ে পিছনে এসে দেখি থার্নিক্রফটের হাতে রিভলভার, ডেক্সটার দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ফ্যাকাশে মুখ করে মেঝের দিকে চেয়ে আছে, আর ফীল্ডিং যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে হতভম্বের মতো বসে আছে, তার চশমার কাচে কোনও তরল পদার্থের ছিটে লেগে তাকে যেন সাময়িকভাবে ধাঁধিয়ে দিয়েছে।

ডেক্সটারের দৃষ্টি যেখানে, সেখানে মাথা থেতলানো অবস্থায় পড়ে আছে আরেকটি গোথুরো। এর জাত কালকের গোখুরোর থেকে আলাদা। ইনিও মিশরের অধিবাসী। এর নাম স্পিটিং কোবরা। ইনি ছোবল না মেরে শিকারের চোখের দিকে তাগ করে বিষের থুথু দাগেন। এতে মৃত্যু না হলেও অন্ধত্ব অবধারিত। ফীল্ডিং বেঁচে গেছে তার চশমার জন্য। আর সাপবাবাজি মরেছেন থার্নিক্রফটের সঙ্গে হাতিয়ার ছিল বলে।

অটোমোটেল থামিয়ে ফীল্ডিং-এর পিছনে কিছুটা সময় দিতে হল। বিষের ছিটে চশমার কাচের তলা দিয়ে বা চোখের কোলে লেগেছিল, সেখানে আমার মিরাকিউরল আয়েন্টমেণ্ট লাগিয়ে দিলাম।

ব্যাপারটা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। অফিশাপ টিভিশাপ নয়; কেউ আমাদের পিছনে লেগেছে। আমরা যখন সরাইখানায় বসে কফি খাচ্ছিলাম। সেই সময় গাড়ির জানালা দিয়ে সাপটাকে ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে এই কাজটা করেছে, সে নিশ্চয়ই কায়রো থেকেই এসেছে।

আবার যখন রওনা দিলাম। তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। বাওয়িতি এখান থেকে আরও একশো কিলোমিটার। ম্যাপে তারপরে আর কোনও রাস্তার ইঙ্গিত নেই, তবে মোটামুটি সমতল জমি পেলে বালি পাথর অগ্রাহ্য করে এ গাড়ি এগিয়ে চলবে। যদি সেটার প্রয়োজন হয়।

মিনিটদশেক চলার পর পথে একই সঙ্গে মানুষ ও জানোয়ারের সাক্ষাৎ মিলল।

একটা বছর পনেরোর ছেলে, হাতে লাঠি, এগিয়ে আসছে রাস্তা ধরে আমাদেরই দিকে তার পিছনে একপাল গাধা।

আমাদের গাড়িটা দেখে হাঁটার গতি কমিয়ে হাতদুটোকে মাথার উপরে তুলে ঝাঁকাতে শুরু করল ছেলেটা।

এসটাপ, এসটাপ, সাহিব! এসটাপ!

ক্রোল বাধ্য হয়েই গাড়ি থামাল, কারণ পথ বন্ধ।

ব্যাপারটা কী? হেডলাইটের আলোতে ছেলেটির চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে, গাধাগুলোও যেন কেমন অস্থির।

হাতছানি দিয়ে আমাদের বাইরে বেরোবার ইঙ্গিত করাতে আমি থামলাম। ছেলেটি দৌড়ে এল আমার দিকে।

পিরমিট, সাহিব, পিরমিট!

ছেলেটি যে প্রচণ্ড রকম উত্তেজিত সেটা তার ঘন ঘন নিশ্বাস আর চোখের চাহনি থেকেই বুঝতে পারছি। কিন্তু এখানে পিরামিড কোথায়?

জিজ্ঞেস করাতে সে সামনে বাঁয়ে দেখিয়ে দিল।

ওগুলো তো পাহাড়-চুনোপাথরের পাহাড়। ওখানে পিরামিড কোথায়?

ছেলেটি তবুও বার বার ওই দিকেই দেখায়।

তার মানে ওগুলোর পিছনে? ক্রোল জিজ্ঞেস করল। ছেলেটি মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল-হ্যাঁ, ওই পাহাড়গুলোর পিছনে।

আমি ক্রোলের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলাম। ইতিমধ্যে বাকি তিনজনও এসে জুটেছে। তাদের বললাম ব্যাপারটা। ফীল্ডিং বলল,আস্ক হিম হাউ ফার।

জিজ্ঞেস করাতে ছেলেটি আবার বলল, টিলাগুলোর পিছনে। কত দূর সেটা জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, কারণ আমি দেখেছি। পৃথিবীর সব দেশেই অশিক্ষিত চাষাভুষোদের দূরত্ব

সম্বন্ধে কোনও ধারণা থাকে না। অর্থাৎ পিরামিড এখান থেকে দু কিলোমিটারও হতে পারে, আবার বিশ কিলোমিটারও হতে পারে।

হিয়ার–থর্নিক্রফট পকেট থেকে কিছু খুচরো পয়সা বার করে ছেলেটার হাতে দিয়ে তার পিঠে একটা চাপড় মেরে বুঝিয়ে দিল–এবার তুমি প্রস্থান করো।

ছেলেটি মহা উল্লাসে পিরামিট পিরামিট করতে করতে গর্দভবাহিনী সমেত যে পথে যাচ্ছিল সে পথেই চলে গেল।

আমরা আবার রওনা দিলাম। আকাশে আলোকবিন্দুর সংখ্যা বাড়ছে, তবে চলমান বিন্দু এখনও কোনও চোখে পড়েনি। আমি জানি পিছনের কামরার তিনজনই জানালায় চোখ লাগিয়ে বসে আছে, বেচারা ক্রোলই শুধু রাস্তা থেকে চোখ তুলতে পারছে না।

মিনিটতিনেক যাবার পরই বাঁয়ে চোখ পড়তে দেখলাম, ছেলেটা খুব ভুল বলেনি।

টিলার আড়াল সরে যাওয়াতে সত্যিই একটা পিরামিড বেরিয়ে পড়েছে। সেটা কত দূর বা কত বড় তা বোঝার উপায় নেই, কিন্তু আকৃতি সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই লাইমস্টোনের রুক্ষ স্তূপগুলোর পাশে ওটা একটা পিরামিডই বটে।

ঈজিপ্টের সব জায়গা দেখা না থাকলেও এটুকু জানি যে এখানে পিরামিড থাকার কথা নয়, আর ভূঁইফোঁড়ের মতো হঠাৎ গজিয়ে ওঠাটাও ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

ক্রোলই বলল যে রাস্তা খারাপ হোক না কেন, একবার কাছে গিয়ে জিনিসটা দেখে আসা দরকার। মহাকাশযান সত্যিই যদি আজ রাত্রেই এসে নামে, তা হলে তার সময় আছে এখনও প্রায় আট ঘণ্টা। আর, আকাশযান এলে আকাশে তার আলো তো দেখা যাবেই, কাজেই কোনও চিন্তা নেই।

অতি সন্তর্পণে বালি আর এবড়োখেবড়ো পাথরের উপর দিয়ে অটোমোটেল এগিয়ে চলল পিরামিডের দিকে।

শখানেক মিটার যাবার পরই বুঝতে পারলাম যে মিশরের বিখ্যাত সমাধিসৌধগুলির তুলনায় এ পিরামিড খুবই ছোট। এর উচ্চতা ত্রিশ ফুটের বেশি নয়।

আরও খানিকটা কাছে যেতে বুঝলাম পিরামিডটা পাথরের তৈরি নয়, কোনও ধাতুর তৈরি। ক্রোলের গাড়ির হেডলাইট পড়ে পিরামিডের গা থেকে একটা তামাটে আলো প্রতিফলিত হয়ে বাঁয়ের টিলাগুলোর উপর পড়ছে।

ক্রোল গাড়ি থামিয়ে হেডলাইট নিভিয়ে দিল। আমরা পাঁচজন নামলাম।

ফীলিন্ডং এগোতে শুরু করেছে পিরামিডটার দিকে।

আমরা তাকে অনুসরণ করলাম।

ক্রোল আমার কানে ফিসফিস করে বলল, কিপ ইওর হ্যান্ড অন ইওর গান। দিস মে বি আওয়ার স্পেসশিপ।

আমারও অবিশ্যি সেই কথাই মনে হয়েছে। গাড়ির ভিতর ছিলাম, তাই আকাশের সব অংশে চোখ রাখতে পারিনি। এই ফাঁকে কখন ল্যান্ড করে বসে আছে কে জানে।

সামনে ফীল্ডিং থেমে হাত তুলেছে। বুঝতে পারলাম কেন। শরীরের একটা উত্তাপ অনুভব করছি। সেটা স্পেসশিপটা থেকেই বেরোচ্ছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কিন্তু এই নৈঃশব্দ্য কেন?

আলো নেই কেন?

নামবার কোনও শব্দ পাইনি কেন?

আর উত্তাপের কারণ কি এই যে এরা আমাদের কাছে আসতে দিতে চায় না?

কিন্তু না, তা তো নয়। উত্তাপ কমে আসছে দ্রুত বেগে।

আমরা আবার পা টিপে টিপে এগিয়ে চললাম পিরামিডের দিকে। মাথার উপরে আকাশ জুড়ে ছায়াপথ দেখা দিয়েছে। মরু অঞ্চলের রাতের আকাশ আমার চিরকালের বিস্ময়ের বস্তু।

ওয়ান-থ্রি-সেভেন–ইলেভেন–সেভ্নটিন–টোয়েন্টি থ্রি...

ফীল্ডিং মৌলিক সংখ্যা আওড়াতে শুরু করেছে। অবাক হয়ে দেখলাম পিরামিডের গায়ে অসংখ্য আলোকবিন্দুর আবির্ভাব হচ্ছে। ওগুলো আসলে ছিদ্র-স্পেসশিপের ভিতরে আলো জ্বলে উঠেছে, আর সেই আলো দেখা যাচ্ছে পিরামিডের গায়ে ছিদ্রগুলির ভিতর দিয়ে।

ফর্টি ওয়ান–ফর্টি সেভ্ন–ফিফটি থ্রি–ফিফটি নাইন...

এটা মানুষেরই কণ্ঠস্বর, তবে আমাদের পাঁচজনের মধ্যে কারুর নয়। এর উৎস ওই পিরামিড।

আমরা রুদ্ধশ্বাসে ব্যাপারটা দেখছি, শুনছি, আর উপলব্ধি করার চেষ্টা করছি।

এবার কথা শুরু হল।–

পাঁচ হাজার বছর পরে আবার আমরা তোমাদের গ্রহে এসেছি। তোমরা আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করো।

ফ্রাঙ্কিং তার ক্যাসেট রেকর্ডার চালু করে দিয়েছে। ডেক্সটার ও ক্রোলের হাতে ক্যামেরা। কিন্তু এখনও ছবি তোলার মতো কিছু ঘটেনি।

আবার কথা। নিখুঁত ইংরিজি, নিখাদ উচ্চারণ, নিটোল কণ্ঠস্বর।

তোমাদের গ্রহের অস্তিত্ব আমরা জেনেছি পঁয়ষট্টি হাজার বছর আগে। আমরা তখনই জানতে পারি যে তোমাদের গ্রহ ও আমাদের গ্রহের মধ্যে কোনও প্রাকৃতিক প্রভেদ নেই। এই তথ্য আবিষ্কার করার পর তখনই আমরা প্রথম তোমাদের গ্রহে আসি, এবং সেই থেকে প্রতি পাঁচ হাজার বছর এসেছি। প্রত্যেকবারই এসেছি। একই উদ্দেশ্য নিয়ে। সেটা হল পৃথিবীর মানুষকে সভ্যতার পথে কিছুদূর এগিয়ে দিতে সাহায্য করা। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে মহাকাশে আমাদের একটি পর্যবেক্ষণপোত এই পঁয়ষট্টি হাজার বছর ধরে পৃথিবীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে আসছে। আমরা যখনই এখানে আসি, তখন পৃথিবীর অবস্থা জেনেই আসি। আমরা অনিষ্ট করতে আসি না। আমাদের কোনও স্বার্থ নেই। সাম্রাজ্যবিস্তার আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল মানুষের সমস্যার সমাধানের উপায় বাতলে দিয়ে আবার ফিরে যাই। আজকের মানুষ বলতে যা বোঝে, সেই মানুষ আমাদেরই সৃষ্টি, সেই মানুষের মস্তিষ্কের বিশেষ গড়নও আমাদেরই সৃষ্টি। মানুষকে কৃষিকার্য আমরাই শেখাই যাযাবর মানুষকে ঘর বাঁধতে শেখাই। গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিজ্ঞান—পৃথিবীতে এসবের গোড়াপত্তন আমরাই করেছি, স্থাপত্যের অনেক সূত্র আমরাই দিয়েছি।

এই শিক্ষা মানুষ কীভাবে কাজে লাগিয়েছে তার উপর আমাদের কোনও হাত নেই। অগ্রগতির কিছু সূত্র নির্দেশ করার বেশি কিছু করা আমরা আমাদের কর্তব্য বলে মনে করিনি। মানুষকে আমরা যুদ্ধ শেখাইনি, স্বার্থের জন্য সাম্রাজ্যবিস্তার শেখাইনি, শ্রেণীভেদ শেখাইনিম কুসংস্কার শেখাইনি। এসবই তোমাদের মানুষের সৃষ্টি। আজ যে মানুষ ধ্বংসের পথে চলেছে, তার কারণই হল মানুষ নিঃস্বার্থ হতে শেখেনি। যদি শিখত, তা হলে মানুষ নিজের সমস্যার সমাধান নিজেই করতে পারত। আজ আমরা তোমাদের হাতে যা তুলে দিতে এসেছি, তার সাহায্যে মানবজাতির আয়ু কিছুটা বাড়তে পারে। সেটা কী সেটা বলার আগে আমরা জানতে চাই তোমাদের কিছু জিজ্ঞাস্য আছে কি না।

আছে।—চেঁচিয়ে উঠল ক্রোল।

করো প্রশ্ন।

www.bengaliebook.com

তোমরা মানুষেরই মতো দেখতে কি না সেটা জানার কৌতূহল হচ্ছে, বলল ক্রোল। – তোমাদের গ্রহের আবহাওয়া যদি পৃথিবীর মতোই হয়, তা হলে তোমাদের একজনের বাইরে বেরিয়ে আসতে কোনও বাধা নেই নিশ্চয়ই।

ক্রোল তার ক্যামেরা নিয়ে রেডি।

উত্তর এল

সেটা সম্ভব নয়।

কেন?-ক্রোলের অবাক প্রশ্ন।

কারণ এই মহাকাশযানে কোনও প্রাণী নেই।

আমরা পাঁচজনেই স্তম্ভিত।

প্রাণী নেই? ফীল্ডিং প্রশ্ন করল, তার মানে কি- ?

কারণ বলছি। একই বছরের মধ্যে একটি প্রলয়ংকর ভূমিকম্প ও একটি বিশাল উল্কাখণ্ডের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে আমাদের গ্রহ থেকে প্রাণী লোপ পায়। অবশিষ্ট আছে কয়েকটি গবেষণাগার ও কয়েকটি যন্ত্র-যার মধ্যে একটি হল এই মহাকাশযান। দুর্যোগের দশ বছর আগে, দুর্যোগের পূর্বাভাস পেয়ে আমাদের বিজ্ঞানীরা পূর্বপরিকল্পিত পৃথিবী-অভিযানের সব ব্যবস্থা করে রেখে গিয়েছিলেন। এই অভিযান সম্ভব হয়েছে যন্ত্রের নির্দেশে। আমি নিজে যন্ত্র। এই আমাদের শেষ অভিযান। t

এবার আমি প্রশ্ন করলাম।

তোমাদের এই শেষ অভিযানের উদ্দেশ্য কী জানতে পারি?

বলছি শোনো, উত্তর এল পিরামিডের ভিতর থেকে।–তোমাদের চারটি সমস্যার সমাধান দিয়ে যাচ্ছি। আমরা। এক-ইচ্ছা মতো আবহাওয়া বদলানো–যাতে খরা বা বন্যা কোনওটাই মানুষের ক্ষতি না করতে পারে। দুই-শহরের দুষিত বায়ুকে শুদ্ধ করার উপায়। তিন–বৈদ্যুতিক শক্তির বদলে সূর্যের রশ্মিকে যৎসামান্য ব্যয়ে মানুষের ব্যাপক কাজে লাগানোর উপায়; এবং চার-সমুদ্রগর্ভে মানুষের বসবাস ও খাদ্যোৎপাদনের উপায়। যে হারে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর পাঁচশো বছর পরে শুকনো ডাঙায় আর মানুষ বসবাস করতে পারবে না।...এই চারটি সূত্র ছাড়াও, শুধু মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য, পৃথিবীর গত পঁয়ষট্টি হাজার বছরের বিবরণ আমরা দিয়ে যাচ্ছি। তোমাদের।

সূত্র এবং বিবরণ কি লিখিতভাবে রয়েছে? প্রশ্ন করল ফাল্ডিং।

হ্যাঁ। তবে লেখার ব্যাপারে মিনিয়েচারাইজেশনের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সাত বছর আগে আমাদের গ্রহে দুর্ঘটনার পর থেকে পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। আশা করি এই কবছরে মিনিয়েচারাইজেশনে তোমরা অনেক দূর অগ্রসর হয়েছ?

হয়েছি বই কী! বলে উঠল। ক্রোল। গণিতের জটিল অঙ্কের জন্য আমরা এখন যে ক্যালকুলেটর ব্যবহার করি, তা একটা মানুষের হাতের তেলোর চেয়ে বড় নয়।

বেশ। এবার লক্ষ করো, মহাকাশযানের গায়ে একটি দরজা খুলে যাচ্ছে।

দেখলাম, জমি থেকে মিটারখানেক উপরে পিরামিডের দেয়ালে একটা ত্রিকোণ প্রবেশদ্বারের আবির্ভাব হল।

যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর বলে চলল–

মহাকাশযানের ভিতরে একটি টেবিল ছাড়া আর কোনও আসবাব নেই। সেই টেবিলের উপর একটি স্বচ্ছ আচ্ছাদনের নীচে যে বস্তুটি রয়েছে, তাতেই পাওয়া যাবে

চারটি সমস্যার সমাধান ও পৃথিবীর গত পঁয়ষট্টি হাজার বছরের ইতিহাস। তোমাদের মধ্যে থেকে যে কোনও একজন প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকে আচ্ছাদন তুলে বস্তুটিকে নিয়ে বেরিয়ে আসামাত্র মহাকাশযান ফিরতি পথে রওনা দেবে। তবে মনে রেখো, সমাধানগুলি সমগ্র মানবজাতির মঙ্গলের জন্য; এই বস্তুটি যদি কোনও স্বার্থপর ব্যক্তির হাতে পড়ে, তা হলে–

কণ্ঠস্বর থেমে গেল।

কারণ কথার মাঝখানেই চোখের পলকে আমাদের সকলের অজান্তে অন্ধকার থেকে একটি মানুষ বেরিয়ে এসে তিরবেগে মহাকাশযানে প্রবেশ করে, আবার তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এসে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

পরমুহূর্তে দেখলাম, ত্রিকোণ প্রবেশদ্বারটি বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা গগনভেদী হাহাকারের মতো শব্দ করে পিরামিড মিশরের মাটি ছেড়ে শূন্যে উত্থিত হল।

আমরা পাঁচ হতভম্ব অভিযাত্রী অপরিসীম বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম একটি চতুষ্কোণ জ্যোতি ছায়াপথের অগণিত নক্ষত্রের ভিড়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

একটা গাড়ি স্টটি দেবার শব্দে আমরা সকলে আবার সংবিৎ ফিরে পেলাম।

গাড়িটা আমাদের না। শুনে মনে হচ্ছে জিপ, এবং সেটা রওনা দিয়ে দিয়েছে।

কাম অ্যালং!–চাবুকের মতো আদেশ এল ক্রোলের কাছ থেকে। সে তার অটোমোটেলের দিকে ছুটেছে।

এক মিনিটের মধ্যে আমাদের গাড়িও ছুটে চলল রুক্ষ মরুভূমির উপর দিয়ে।

কোন দিকে গেল জিপ? রাস্তায় গিয়ে তো উঠতেই হবে তাকে।

শেষপর্যন্ত একটা কনফাটা সংঘর্ষের শব্দ, ও ক্রোলের গাড়ির তীব্র হেডলাইট জিপটার হদিস দিয়ে দিল। হেডলাইট না জ্বালিয়েই মরিয়া হয়ে ছুটে চলেছিল সেটা, আর তার ফলেই জমিতে পড়ে থাকা প্রস্তরখণ্ডের সঙ্গে সজোর সশব্দ সংঘাত।

আর তাড়া নেই, তাই সাবধানে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে ক্রোল তার গাড়িটাকে জিপের দশ হাত দূরে দাঁড় করাল। আমরা পাঁচজনে নেমে এগিয়ে গেলাম।

জিপের দফা শেষ। সেটা উলটে কত হয়ে পড়ে আছে বালি ও পাথরের মধ্যে, আর তার পাশে রক্তাক্ত দেহে পড়ে আছে দুজন লোক। একজন স্থানীয়, সম্ভবত গাড়ির চালক, আর অন্যজন—থর্নিক্রফটের টর্চের আলোয় চেনা গেল তাকে—হলেন মার্কিন ধনকুবের ও শখের প্রত্নতত্ত্ববিদ গিডিয়ন মর্গেনস্টার্ন।

সাপ ও শকুনের রহস্য মিটে গেল। কার্ণাক হোটেলের ম্যানেজার নাহুমের সঙ্গে এনার ষড় ছিল নিঃসন্দেহে। স্বার্থন্বেষণের পথে যাতে কোনও বাধা না আসে, তাই আমাদের হটাবার জন্য এত তোড়জোড়। এটা বেশ বুঝতে পারছি যে মর্গেনস্টার্নের মৃত্যু হয়েছে প্রাচীন মিশরের কোনও দেবতার অভিশাপে নয়; তার উপর অভিশাপ বর্ষণ করেছে ছায়াপথের একটি বিশেষ নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিত একটি বিশেষ গ্রহ।

লোকটার পকেটে ওটা কী?

ক্রোল এগিয়ে গিয়ে মর্গেনস্টার্নের পকেট থেকে একটি জীর্ণ কাগজের টুকরো টেনে বার করল। সেটা যে মেনেফুর প্যাপাইরাসের ছেড়া অংশ সেটা আর বলে দিতে হয় না।

কিন্তু এ ছাড়াও আরেকটা জিনিস আমি লক্ষ করেছি।

মর্গেনস্টার্নের মুঠো করা ডান হাতটা বালির উপর পড়ে আছে, আর সেই মুষ্টিবদ্ধ হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে একটা নীল আভা বেরিয়ে পাশের বালির উপর পড়েছে।

ফীল্ডিং এগিয়ে গিয়ে মুঠোটা খুলল।

www.bengaliebook.com

এই কি সেই বস্তু, যার মধ্যে ধরা রয়েছে মানবজাতির চারটি প্রধান সংকটের সমাধান, আর পৃথিবীর পঁয়ষট্টি হাজার বছরের ইতিহাস?

ফীল্ডিং তার ডান হাতের তর্জনী আর বুড়োআঙুলের মধ্যে ধরে আছে একটি দেদীপ্যমান প্রস্তরখণ্ড, যার আয়তন একটি মটরদানার অর্ধেক।

২৭শে নভেম্বর, গিরিডি

এই আশ্চর্য পাথরের টুকরোর মধ্যে কী করে এত তথ্য লুকিয়ে থাকতে পারে, সেটা যদি কেউ বের করতে পারে তো আমিই পারব, এই বিশ্বাসে আমার চার বন্ধু সেটা আমাকেই দিয়ে দিয়েছে। আমি গত দু সপ্তাহ ধরে আমার গবেষণাগারে অজস্র পরীক্ষা করেও এটার রহস্য উদঘাটন করতে পারিনি। আমি বুঝেছি আরও সময় লাগবে, কারণ আমাদের বিজ্ঞান এখনও এতদূর অগ্রসর হয়নি।

পাথরটা আপাতত আমার ডান হাতের অনামিকায় একটি আংটির উপর বসানো রয়েছে। রাতের অন্ধকারে যখন বিছানায় শুয়ে এটার দিকে দেখি, তখন এই অপার্থিব রত্নখণ্ড থেকে বিচ্ছুরিত নীলাভ আলো আমাকে আজীবন অক্লান্ত গবেষণার সাহায্যে মানুষের মনের অন্ধকার দূর করার প্রেরণা জোগায়।

আনন্দমেলা। পূজাবার্ষিকী ১৩৮৬